বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য-ভারতী
কলিকাতা-১৪

প্রকাশিকা :

শ্রীমতী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি টি।

সূর্য-ভারতী :

৮৮সি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড,

কলিকাতা-১৪

মুদ্রক :

সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বস্তিক মুদ্রণালয়

২৭।১বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট : মোহন প্রেস, কলিকাতা-৯

পরিবেশক : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা আশ্বিন, ১৩৬৬

মূল্য ৩·২৫ টাকা

পরম শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠতাত

শ্রীশ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীচরণে—

সূর্য-ভারতীর কয়েকখানি গ্রন্থ :

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসুর কাব্যগ্রন্থ

মুখর মৌন

বাতায়নের আকাশ (যন্ত্রস্থ)

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা গ্রন্থ:

কবিগুরুর রক্তকরবী (২য় সংস্করণ)

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা

পরিবেশক :

সিগনেট বুক শপ, শান্তি লাইব্রেরী, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী।

প্রথম অধ্যায়

ধর্মচেতনা

১

চলিষ্ণু জীবনে পরিবেশের যেমন বৈচিত্র্য ঘটে, জীবনের ধ্যান-ধারণাও তেমনি বদলাতে থাকে। সেই পরিবর্তিত জীবন-বোধে জীবন-জিজ্ঞাসাও যেমন নিত্য নূতন দৃষ্টিকোণ লাভ করে, আমাদের রসিকতাও তেমনি বিচিত্ররূপে পরিতৃপ্ত হয়। জীবনের এই চলমানতার অন্তরালে যাঁরা জীবনের একটা ধ্রুব রূপ দেখতে পান, তাঁরা জীবনের একটা বিশেষ ধর্ম ও নীতি স্থির করে নেন। এতে যে তাঁরা জীবনের চলমানতাকে অস্বীকার করেন তা নয়, কিন্তু এই পরিবর্তনশীল জীবনের মধ্যেই অপরিবর্তনীয় কিছুকে তাঁরা আস্বাদন করেন। জীবন বহুর মধ্যে চঞ্চল, একের মধ্যে স্থির। এই বহুর বৈচিত্র্য থেকে যাঁরা একের একাকিত্বের দিকে যান, তাঁদের রসিকতা ধ্রুবাশ্রিত, বাণী তত্ত্বগর্ভ এবং বেদনা জ্ঞান-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাঁদের সঙ্গীতে বহু তাল-লয়ের খেলার মধ্যে সানাইয়ের মূল সুরটি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বারে বারেই তাঁরা যেন একটা ধুয়োয় ফিরে আসেন, জীবনটাকে স্পষ্ট করে ছুঁয়ে যাওয়ার দিকে তাঁদের রসিকতার একটা ঝোঁক দেখতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র এমনই এক জীবন-রসিক। বঙ্কিম বলেন: অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব, লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সে ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।

নিত্য পরিবর্তনশীল জীবন-বোধেও মনুষ্যত্ব কথাটিতে আমরা রস পাই। জীবনকে যে ভাবেই দেখি না কেন, মনুষ্যত্ব কথাটির মধ্যে একটা সার্বজনীনতা আছে। কিন্তু ঈশ্বর কথাটিতে বর্তমান যুগে আমরা সকলেই যে রস পাই, তা নয়।

ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও তো আমাদের জীবন চলে। আমাদের কাম-কামনা, সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার জীবনে আমরা কত ভাবে লীলায়িত হই। কখনও কাঁদি, কখনও হাসি, কখনও চলি, কখনও থামি, কখনও পাই, কখনও ঠকি। জীবনের এই বিচিত্র লীলার মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করবার অবকাশ হয় না, হয়তো প্রয়োজনও হয় না। তাতেও তো হাসির অভাব নেই, গানের অবসান নেই।

হাসি শুকিয়ে যায়? গান থেমে যায়? তাতেই বা ক্ষতি কি? খানিক কাঁদি, খানিক চুপ করে থাকি, তারপর চোখের জল মুছে আবার উঠি, আবার হাসি। এক টুকরো ভেসে যাওয়া মেঘের মতন কখনও বৈশাখের তৃষ্ণা নিয়ে মরুভূমি পার হই, কখনও আষাঢ়ের সম্ভাবনায় শ্যামল বনভূমির ওপর নিবিড় হয়ে উঠি, কখনও শারদোৎসবের লীলায় নীলিমার স্বর্ণালোকে পুঞ্জীভূত হই, শীতের জড়তায় কখনও হই করুণার্ত, আবার কখনও বসন্তের গোধূলিতে সূর্যাস্তের সমারোহে চিত্রিত হই নানা রঙে। এখানে চলাই শেষ কথা, পথই শেষ কথা, গৌরীশঙ্করের তীর্থে গিয়ে সে মেঘ পৌঁছাবে কিনা সে কথা কেউ নানা অঙ্ক কষে স্থির করুন, মেঘের সে ভাবনা নেই।

বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করবেন: তাহলে মনুষ্যত্ব কি?

উত্তর কি দেব: বাস্তবতা-ই মনুষ্যত্ব? মানুষের স্বভাই সেই বাস্তব?

কিন্তু মানুষের 'স্ব' বা 'self' এরও তর-তম ভেদ আছে। প্রকৃতি থেকে যা কিছু পেয়েছি তাই নিয়ে—আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভাল-মন্দ, স্থূল-সূক্ষ্ম সব কিছু নিয়ে যা আমাদের মধ্যে আছে সেই বাস্তব মানুষটার যে ভাব, তাকেই আমরা সাধারণতঃ মানুষের স্ব'ভাব তথা মনুষ্যত্ব বলে থাকি। এই স্ব, বাস্তব স্ব।

কিন্তু এ ছাড়াও এক বৃহত্তর স্ব আছে। তা এই বাস্তব স্ব-এরই বিকাশ—বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন—'Manifestation of Perfiction' কিংবা 'Manifestation of Divinity, *already in man*.

তাহলে মনুষ্যত্ব কি? বাস্তব স্ব-এর চর্চায় পূর্ণতা এবং দিব্যতাকে জীবনে রূপ দেওয়া, তথা বাস্তব স্ব-কে বৃহত্তর স্ব-তে বিকশিত করা,—এই হল মনুষ্যত্ব।

বঙ্কিম তাই বলবেন, স্ব-এর বিকাশই মনুষ্যত্ব—পরিণত মানুষের স্ব'ভাবই মনুষ্যত্ব।

আমরা চিনি মানুষকে, রস পাই মানুষের কথায়; বঙ্কিম চেনেন পরিণত মানুষকে, রস পান পরিণত মানুষের কথায়।

মানুষ এবং পরিণত মানুষ, এই দুই পর্যায়ে ভাগ করলে জীবনবোধের অনেকখানি তারতম্য ঘটে যায়। পরিণত মানুষ তো খুব বেশি নয়, তাই জীবনের অনেকখানি যে ফেলা যায়। মানুষের হাসিকান্না সুখ-দুঃখ নিয়েই তো জীবনের লীলা। পরিণত মানুষেরও হাসিকান্না সুখ-দুঃখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে তো সব সময় আমাদের সহানুভূতির অধীন নয়, তাই তার কথায় আমরা হয়তো সর্বদা

রস পাই না। যে মানুষটা শুধু মানুষ বলেই হেরে যায়, পড়ে যায়, সেই মানুষের কথায় আমাদের রসিকতা পরিতৃপ্ত। পরিণত মানুষকে আমরা দূর থেকে দেখি, তার সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন প্রাত্যহিক জীবনের কারবার কম।

বঙ্কিম আবার শুধু পরিণত মানুষ বলেই ক্ষান্ত হন নি, এই কথাটা ধরে, স্ব-এর বিকাশ ধরে তিনি "পরিপূর্ণ মানুষে" গিয়ে উপনীত হয়েছেন। বঙ্কিম তাই বলেন : যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলা যায়।

'পরিপূর্ণ মানব' কথাটি আমাদের কাছে তত্ত্ব-মূলক। আমাদের কাছে তা কিছুটা আদর্শগত, কিছুটা বা অবাস্তব। 'পরিপূর্ণ মানুষ' এই কথাটি শুনলেই আমাদের প্রথমভাগের 'গোপাল বড় সুবোধ বালক' এই কথাটা মনে পড়ে যায়, এবং দুরন্ত বালক রাখালের মত পাঠশালা পালিয়ে জীবনের পথে পথে যথেচ্ছ খেলে বেড়াবার জন্যে বিদ্রোহ জাগে। এই বিদ্রোহকে সুবোধেরা গাল পাড়তে পারেন, কিন্তু ঠেকাতে পারেন না এই বিদ্রোহিতার তরঙ্গগুলো উঠেই তো জীবনকে ছন্দায়িত করে, জীবনটা নেচে নেচে চলতে থাকে। জীবনের সেই নৃত্য নিয়েই তো নাটক, সেই নাট্যবোধেই তো রসিকতার তৃপ্তি। তা নইলে উপনিষদের প্রভাতে পুষণের সেই অপাবৃত সত্য-মূর্তি-দর্শনের প্রার্থনা-মন্ত্রটির সুরে সানাইয়ের সুরটি মিলিয়ে নিয়ে জীবনটাকে যদি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে কল্যাণতম রূপের দিকে যাত্রা করানো যেত, তাহলে আমাদের সমস্ত ক্রন্দনগুলি ঘুচে যেত, একটি সুগম্ভীর সাম-গানে নীল আকাশের তলায় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের জীবন পরিপূর্ণতার চরণে একটি পরিপূর্ণ প্রণাম হয়ে প্রকাশ পেত।

পরিণত মানুষের প্রার্থনা—যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। অপরিণত মানুষের প্রার্থনা—তার বোধ হয় এমন কোন প্রার্থনা নেই।

আমাদের বাসনা আছে, কামনা আছে, আকাঙ্ক্ষাও কিছু আছে, কিন্তু প্রার্থনা নেই। বস্তু-জীবনের নানা অভাববোধ থেকে জাগে বাসনা-কামনা ; পরিপূর্ণতার অভাববোধ থেকে জাগে প্রার্থনা। পরিণত মানুষ হয়তো পরিপূর্ণ মানুষ নয়, কিন্তু পরিপূর্ণতার অভাববোধ তার মধ্যে আছে। অপরিণত মানুষের সে অভাববোধ নেই, তাই তার বাসনা কামনা আছে, কিন্তু প্রার্থনা নেই।

বঙ্কিম পরিপূর্ণতার রসিক, পরিণত মানুষের স্বভাবে তাঁর আনন্দ। পরিণত মানুষের সেই প্রার্থনাকে বঙ্কিম স্পষ্ট করে জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন।

পরিপূর্ণতার স্বভাবকে বঙ্কিম বলেছেন মনুষ্যত্ব, পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে বঙ্কিম বলেছেন ধর্ম-চেতনা।

পরিপূর্ণতার চেতনাই বঙ্কিমের জীবন-রস-রসিকতা। এই রসিকতায় জীবনের কোন্ আনন্দরূপটি তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, জীবনের কোন্ লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, জীবনের কোন্ বেদনাকে তিনি সুরে সাধতে চেয়েছেন, আমরা তাই বুঝে দেখবার চেষ্টা করব। আমাদের আজকের জীবনবোধের ভূমিকায়, আমাদের বেদনার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমরা যদি তার মিল নাও পাই, তবু শ্রদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হলে, আমরা কি জানি, কি ভাবি, সেটা দিয়ে আড়াল না করে, বঙ্কিম কি জেনেছেন, কি ভেবেছেন, সে-কথায় পৌঁছাতে পারলে এক অভিনব রসের ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারব বলেই আমাদের বিশ্বাস। সাময়িকতার নানা অভিমানে আমরা আমাদের জীবনবোধকে একচুলও ক্ষুণ্ণ করতে চাই না, কিন্তু রসিকতার ক্ষেত্রে আমরা সর্বত্র প্রবেশাধিকার পাই। কোন পূর্বসংস্কার ত্যাগ করাই সে অধিকার অর্জনের একমাত্র উপায়। শ্রদ্ধাই আমাদের সংস্কার মুক্ত করে। একের সঙ্গে অন্যের তো সব দিক দিয়েই অনেক প্রভেদ, শ্রদ্ধায় একজন আর একজনের কাছে এসে বসতে পারি, তার কথা শুনতে পারি, তারপর তা মানি আর না মানি সে কথা আলাদা। বঙ্কিম-জিজ্ঞাসাতেও আমরা সংস্কার-মুক্ত চিত্তে সেই শ্রদ্ধা নিয়ে আসতে চাই, জানতে চাই বঙ্কিম কি দেখেছেন, কি বলেছেন, তারপর তা মানি কিনা সে কথা পৃথক, অন্ততঃ আমাদের জিজ্ঞাসায় সে নির্দেশ নেই।

পবিপূর্ণতার রসিক বঙ্কিম পরিপূর্ণতাকে খুব স্পষ্ট করে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। একে তিনি জীবন-বহির্ভূত একটা তত্ত্ব হিসেবে দেখেন নি, জীবনের মধ্যে তিনি একে একান্ত সত্য বলেই বুঝেছেন। বঙ্কিম তাই প্রথমেই বৈদিক ক্রিয়া কর্ম ও ঔপনিষদিক ধ্যান-ধর্মের যে অনুষ্ঠান ও তত্ত্বমুখিতা, তা থেকে সরে এলেন। বেদ সম্বন্ধে বঙ্কিম বললেন : 'বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট।' ভক্তি কথাটি আমরা পরে বুঝে দেখব, কিন্তু বেদ সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই উক্তির তাৎপর্য হল এই যে, বেদে কাম্যবস্তুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির নানা নির্দেশ আছে, দেবতাদের প্রসন্ন করার নানা প্রয়াস আছে, কিন্তু যে পরিপূর্ণতাকে দেখে নিজেকে তৈরী করব, সে পরিপূর্ণতার স্পষ্ট চিত্রটি সেখানে সামনে নেই। তাই ঋগ্বেদের সেই সুন্দর সূর্য-প্রার্থনাটি, যেখানে ঋষি বলেছেন, হে পূষণ, যদি জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নে, কিছুমাত্র পাপের চিন্তা করে

থাকি, তবে তার অনুশোচনায় কালরাত্রি যেন দীর্ঘ না হয়—সেই প্রার্থনাটির কথা বঙ্কিম একটু লঘুভাবেই তাঁর ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় উল্লেখ করে গেছেন। উপনিষদে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় যেখানে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও বঙ্কিম জ্ঞানমার্গ থেকে সরে এসেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের যে শ্লোকটিতে আত্মরতির কথা বলা হয়েছে, সেই শ্লোকটি গ্রহণ করেছেন। সেখানে আছে,—আত্মায় যাহার আনন্দ সে স্বরাজ হয়। [আত্মৈবেদং সর্বমিতি স বা এষ এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি] এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি শাণ্ডিল্যের বচনটি উল্লেখ করেছেন ঃ—সর্বকথা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যহীন, এবং আপ্তকামহেতু আদরের অপেক্ষা করেন না, এ আমার আত্মার হৃদয়ের মধ্যে ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া, ইঁহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না।

পরিপূর্ণতা যেখানে নিছক তত্ত্বস্বরূপ নয়, যেখানে তাকে আমাদের চেতনা দিয়ে, ধ্যানে ধারণায় ধরতে ছুঁতে পারি, বঙ্কিম সেখানেই আনন্দ পেয়েছেন। তাই বেদান্তসার কর্তা সদানন্দাচার্যের টীকা অনুসরণ করে বঙ্কিম শাণ্ডিল্যের সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ভূমিকায় পূর্বোক্ত শ্লোকটি গ্রহণ করেছেন।

পরিপূর্ণতা বলতে বঙ্কিম মানুষেরই পরিপূর্ণতা বুঝেছেন। পরিপূর্ণ মানুষের দিকে দৃষ্টি ছিল বলেই বঙ্কিমের ব্রহ্মা-জিজ্ঞাসা সগুণ ঈশ্বরকে অতিক্রম করে নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে যায় নি। বেদান্তে যাকে 'চতুর্থ' তত্ত্ব বলা হয়েছে—বঙ্কিম তা সম্ভবতঃ বোঝেন না, বা বুঝতে-ও চান না। সমাজ-মঙ্গলে ও মনো-ধর্মবিকাশেই বঙ্কিমের সাধনা। এই জন্যে উচ্চতর দর্শন-বিচারে বঙ্কিমকে নির্মম বাস্তববাদী বলাও অসঙ্গত নয়। বঙ্কিমের দেব-সংস্কার পূর্ণ ভাবেই মানবিক ও স্বাভাবিক। যদিও এই স্বভাব সংস্কারের ভিন্নতর তাৎপর্য। বঙ্কিমের ভাগবত চেতনার মূলে এই একটা সংস্কারকে আমাদের প্রথমেই চিনে নিতে হবে। বঙ্কিম বলেন : মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না আমাদের সে শক্তি নাই।

জীবনের পরিপূর্ণতা বলতে বঙ্কিম যা বোঝেন, নির্গুণ ব্রহ্ম তাকে অতিক্রম করে আছেন। মানবজীবনের পরিপূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম সগুণ ঈশ্বর পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। জীবনকে অস্বীকার করেন নি বলেই বঙ্কিম সন্ন্যাসিতাকে

স্বীকার করেন না। বঙ্কিমের মতে সন্ন্যাসীর সাধনা ভগবৎমুখী হলেও সন্ন্যাসী মানব সমাজের আদর্শ পুরুষ হতে পারেন না। বঙ্কিম বলেন: "যাঁহারা সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের নিকট অপত্য-প্রীতি ও দম্পতি-প্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরমধর্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী-দিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না"।

যে ভ্রান্ত আদর্শের অনুসরণে, যে বিকৃত পূর্ণতার দৃষ্টান্তে জীবনের ভারসাম্য কিছুমাত্র নষ্ট হয়, নিটোল জীবন কোনদিকে একটু টোল খেয়ে যায়, বঙ্কিম চারদিকে আটঘাট বেঁধে তাকে একটু দূরেই রেখেছেন। বঙ্কিম জীবনের একটু-খানিও ফেলে দিতে নারাজ, কেন না সেই একটুখানি ফেলে দেওয়ার জন্যে যে অনেকখানি বিকার যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে জমা হয়ে এসেছে। তার বেদনা বঙ্কিমকে যত বেশি দগ্ধ করেছে, এমন আর কিছুতে নয়। বঙ্কিমের সে অন্তর্দাহের পরিচয় আমরা পরে নেব। কিন্তু এখন এই কথাটাই জেনে রাখি যে, সেই চিত্ত-দাহনেই বঙ্কিম জীবন-প্রেমিক, সেই জীবন প্রেমেই বঙ্কিমের সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা। সেই বিকারের দিকে দৃষ্টি রেখেই বঙ্কিম এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন—যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

এই আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে বঙ্কিম মহাত্মা যীশু, প্রভু বুদ্ধ ও ভগবান শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মনে মনে একরূপ কলহই করেছেন। তাৎকালিক মিশনারী পাদ্রিদের এবং ইংরাজী শিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গীয়দের উৎপাতে বঙ্কিম যেন অনেকটা বর্ম পরেই সেই আদর্শের, অর্থাৎ কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতিষ্ঠায় নেমে ছিলেন। তাই কথার মধ্যে 'হিন্দুয়ানির' ঝাঁজটা যেমন একটু বেশি হয়ে পড়েছে তেমনি খ্রীষ্টিয়ান জাতির প্রতি বিদ্রূপ এবং মহাত্মা যীশুর প্রতি কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে; শুধু গৃহী হতে পারেন নি বলে নয়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে মহাত্মা যীশুর আরও কয়েকটা অপূর্ণতা বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন। যেমন, যীশু যুদ্ধ করতে পারতেন না। এবং যীশু অশিক্ষিত। মানব চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতার জন্যে বঙ্কিম জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। বলা বাহুল্য, এ জ্ঞান শুধু ধর্মজ্ঞান নয়, ধর্মজ্ঞান হলে দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক যীশুর সে জ্ঞান ছিল। যদি ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞানের শেষ কথা হয়, যে জ্ঞানে, যস্মিন্ সর্বানি-

ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত—তবে যীশু, শাক্যসিংহ, শ্রীচৈতন্য—এই মহাত্মারা জ্ঞানের উচ্চশিখরেই উপনীত হয়েছেন। বঙ্কিম কিন্তু জ্ঞানের পরিপূর্ণতার জন্যে বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান—এই দুই জ্ঞানের কথা বলেছেন। বহির্বিজ্ঞান বলতে বঙ্কিম কোম্‌তের নির্দিষ্ট Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Biology এবং Sociology এই ছয় শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের কথা বলেছেন। অন্তর্বিজ্ঞান বলতে হিন্দু-দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিপূর্ণ জ্ঞানের এই ধারণাতেই বঙ্কিমকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছে, যীশু অশিক্ষিত।

এর জবাব দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি নিরক্ষর ছিলেন, 'অশিক্ষিত' ছিলেন, কিন্তু যিনি মূর্তিমান জ্ঞান, যাঁর কষ্ঠি-পাথরে তৎকালীন সব পণ্ডিতেরাই নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিকে কষে দেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শ্রীম দেবী চৌধুরাণী পড়ে শোনাচ্ছেন। বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্বানুযায়ী ভবানীঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন। প্রফুল্ল নেড়া মাথায় ভবানীঠাকুরের "বাছা বাছা শিষ্যের সঙ্গে অবনত মুখে শাস্ত্রীয় আলাপ শুনতে লাগল"।

শ্রীম পড়ছেন: "তারপর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ব্যাকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু ন্যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: এর মানে কি জানো? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব সেই লোকের মত। এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্তে হয়, তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে, আমার এত খবরে কাজ কি? যো সো করে—স্তব করেই হোক আর দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্তে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয় তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণতাকে মানবিক করে দেখার জন্যেই বঙ্কিম তাঁর বিচারে ঠিক এ ভাবে অগ্রসর হন নি। মানুষের সকলপ্রকার বৃত্তির সামঞ্জস্যময় বিকাশের দৃষ্টান্তে যীশু, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, সকলকে ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণকেই বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন। আজকে হয়তো আমরা বঙ্কিমের দৃষ্টিকোণ না-ও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা আমরা বুঝে দেখব।

স্বীকার করেন না। বঙ্কিমের মতে সন্ন্যাসীর সাধনা ভগবৎমুখী হলেও সন্ন্যাসী মানব সমাজের আদর্শ পুরুষ হতে পারেন না। বঙ্কিম বলেন: "যাঁহারা সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের নিকট অপত্য-প্রীতি ও দম্পতি-প্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরমধর্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী-দিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না"।

যে ভ্রান্ত আদর্শের অনুসরণে, যে বিকৃত পূর্ণতার দৃষ্টান্তে জীবনের ভারসাম্য কিছুমাত্র নষ্ট হয়, নিটোল জীবন কোনদিকে একটু টোল খেয়ে যায়, বঙ্কিম চারদিকে আটঘাট বেঁধে তাকে একটু দূরেই রেখেছেন। বঙ্কিম জীবনের একটু-খানিও ফেলে দিতে নারাজ, কেন না সেই একটুখানি ফেলে দেওয়ার জন্যে যে অনেকখানি বিকার যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে জমা হয়ে এসেছে। তার বেদনা বঙ্কিমকে যত বেশি দগ্ধ করেছে, এমন আর কিছুতে নয়। বঙ্কিমের সে অন্তর্দাহের পরিচয় আমরা পরে নেব। কিন্তু এখন এই কথাটাই জেনে রাখি যে, সেই চিত্ত-দাহনেই বঙ্কিম জীবন-প্রেমিক, সেই জীবন প্রেমেই বঙ্কিমের সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা। সেই বিকারের দিকে দৃষ্টি রেখেই বঙ্কিম এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন—যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

এই আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে বঙ্কিম মহাত্মা যীশু, প্রভু বুদ্ধ ও ভগবান শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মনে মনে একরূপ কলহই করেছেন। তাৎকালিক মিশনারী পাদ্রিদের এবং ইংরাজী শিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গীয়দের উৎপাতে বঙ্কিম যেন অনেকটা বর্ম পরেই সেই আদর্শের, অর্থাৎ কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতিষ্ঠায় নেমেছিলেন। তাই কথার মধ্যে 'হিন্দুয়ানির' ঝাঁজটা যেমন একটু বেশি হয়ে পড়েছে তেমনি খ্রীষ্টিয়ান জাতির প্রতি বিদ্রূপ এবং মহাত্মা যীশুর প্রতি কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে; শুধু গৃহী হতে পারেন নি বলে নয়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে মহাত্মা যীশুর আরও কয়েকটা অপূর্ণতা বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন। যেমন, যীশু যুদ্ধ করতে পারতেন না। এবং যীশু অশিক্ষিত। মানব চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতার জন্যে বঙ্কিম জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। বলা বাহুল্য, এ জ্ঞান শুধু ধর্মজ্ঞান নয়, ধর্মজ্ঞান হলে দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক যীশুর সে জ্ঞান ছিল। যদি ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞানের শেষ কথা হয়, যে জ্ঞানে, যস্মিন্ সর্বানি-

ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌ বিজানতঃ তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত—তবে যীশু, শাক্যসিংহ, শ্রীচৈতন্য—এই মহাত্মারা জ্ঞানের উচ্চশিখরেই উপনীত হয়েছেন। বঙ্কিম কিন্তু জ্ঞানের পরিপূর্ণতার জন্যে বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান—এই দুই জ্ঞানের কথা বলেছেন। বহির্বিজ্ঞান বলতে বঙ্কিম কোম্‌তের নির্দিষ্ট Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Biology এবং Sociology এই ছয় শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের কথা বলেছেন। অন্তর্বিজ্ঞান বলতে হিন্দু-দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিপূর্ণ জ্ঞানের এই ধারণাতেই বঙ্কিমকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছে, যীশু অশিক্ষিত।

এর জবাব দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি নিরক্ষর ছিলেন, 'অশিক্ষিত' ছিলেন, কিন্তু যিনি মূর্তিমান জ্ঞান, যাঁর কষ্টি-পাথরে তৎকালীন সব পণ্ডিতেরাই নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিকে কষে দেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শ্রীম দেবী চৌধুরাণী পড়ে শোনাচ্ছেন। বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্বানুযায়ী ভবানীঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন। প্রফুল্ল নেড়া মাথায় ভবানীঠাকুরের "বাছা বাছা শিষ্যের সঙ্গে অবনত মুখে শাস্ত্রীয় আলাপ শুনতে লাগল"।

শ্রীম পড়ছেন: "তারপর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। ব্যাকরণ পড়া হল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু ন্যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: এর মানে কি জানো? না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব সেই লোকের মত। এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর; ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্তে হয়, তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এসব আগে, আমার এত খবরে কাজ কি? যো সো করে—স্তব করেই হোক আর দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্তে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয় তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণতাকে মানবিক করে দেখার জন্যেই বঙ্কিম তাঁর বিচারে ঠিক এ ভাবে অগ্রসর হন নি। মানুষের সকলপ্রকার বৃত্তির সামঞ্জস্যময় বিকাশের দৃষ্টান্তে যীশু, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, সকলকে ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণকেই বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন। আজকে হয়তো আমরা বঙ্কিমের দৃষ্টিকোণ না-ও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তা আমরা বুঝে দেখব।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা অর্জুনকে পরিপূর্ণ করে তোলারই উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণ-বাণীতে অর্জুন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবেন। পরিপূর্ণতার রসিক বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশ আমাদের আবার শোনাতে চেয়েছেন।

২

গীত-ভাষ্যের ভূমিকায় বঙ্কিম বলেছেন যে, অনেক জ্ঞানী গুণীর ভাষ্য ও টীকা থাকা সত্ত্বেও তিনি গীতার টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার কারণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হবার সম্ভাবনা, পূর্ব পণ্ডিতদের কৃত ভাষ্যাদিতে তার মীমাংসা নেই। পাশ্চাত্ত্য-ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম বোঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য। Humanism হল এই পাশ্চাত্ত্য ভাবের মূল কথা। সেই মানবধর্মের দিক থেকেই বঙ্কিম গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্বের ভাষ্যকারেরা 'মানব-কৃষ্ণে'র দিকে দৃষ্টি দেন নি, বঙ্কিম বিশেষ করে 'মানব কৃষ্ণের' কথা বলেছেন, যদিও সে মানব হল পরিপূর্ণ মানব।

পরিপূর্ণতার দিকে ভারতবর্ষের যে সহজ প্রবণতা, বঙ্কিমের চেতনায় সহজেই তা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, আবার পরাধীন ভারতের নানা বিকারের বেদনায় বঙ্কিমের মধ্যে যে মানবপ্রেমের উজ্জীবন হয়েছে, তাতে সেই পরিপূর্ণতাকে মানবিক করে দেখার ভঙ্গি এনে দিয়েছে। মানুষকে পরিপূর্ণ করে দেখার আকাঙ্ক্ষাতেই বঙ্কিমের মধ্যে এক অভিনব ধর্ম-চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

মানবকৃষ্ণের চরিত্রব্যাখ্যায় বঙ্কিমকে দুই প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রেষ্ঠ মানব সে কথা নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, আর একদিকে প্রাচ্য পণ্ডিতদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রাকৃততাকে খণ্ডন করেছেন। বঙ্কিম বলতে চান যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি নরদেহ ধারণ করে থাকেন, তবে নরদেহে তিনি মানুষের কর্ম্মই করবেন। তাই তাঁর নরদেহের লীলার মধ্যে অতিমানবিক কাজের সন্ধান করব না, নরদেহে তিনি মানুষেরই আদর্শ; অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে তিনি সে আদর্শের অতীত হয়ে যাবেন না। যুক্তিবাদী বঙ্কিম এদিক থেকে চিত্তকে সর্ববিধ সংস্কারের ঊর্ধ্বে রেখেছেন। আমাদের যে আধ্যাত্মিকতা

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতকে মেনে বসে এবং বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে সঙ্গতি রাখতে না পেরে যে কল্পনা কেবলই জীর্ণ হতে থাকে, বঙ্কিম তাঁর মোহমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে প্রথমেই সে কল্পনাকে মার্জিত করে নিয়েছেন। মানুষের যে আচরণের যুক্তি দিয়ে অথবা হৃদয় দিয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, সে আচরণকে বঙ্কিম শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। এই জন্যে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের অলৌকিক বিষয়গুলিকে তিনি মূল মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে বাতিল করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলারও একটা মানবিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদ দেওয়াতে আমরা অসঙ্গতি দেখি না, কিন্তু মানবকৃষ্ণের রাসলীলায় রাসলীলার আধ্যাত্মিকতা যে পরিমাণে হ্রাস পায়, তাতে রাসলীলার মূল তাৎপর্যটি ঢাকা পড়ে বলেই আমাদের বিশ্বাস। রাস-লীলার নায়ককে প্রাকৃত নায়ক বলে ধরলে—তা সে নায়ক যতই পরিপূর্ণ মানব হোন না কেন—তাতে যে নাচের সভার সৃষ্টি হয়, পরিপূর্ণ মানব বলে কৃষ্ণের মহিমা তাতে কিছু ক্ষুণ্ণ না হতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত নায়িকা হিসাবে গোপীদের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়, তা সে যতই তারা কৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করুক না কেন। প্রাকৃত নায়িকার স্বামী বর্তমান থাকতে নরদেহধারী ঈশ্বরও তার 'নাচের সঙ্গী' হতে পারে না, কারণ স্বামী বেচারার তাতে বিশেষ আপত্তি থাকতে পারে এবং সংবাদ পেলে নরদেহধারী ঈশ্বরের নরলীলা ঘুচিয়ে দেবারই আয়োজন করবে সে।

রাসলীলার তত্ত্বকে বঙ্কিম তাঁর ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবন-সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা।

যদি এটা রূপক কাহিনী হয়, তা হলে সমস্যা ঘুচে গেল, কেন না রূপক কাহিনীর নায়ক বাস্তব নয়। কিন্তু বঙ্কিমের কাছে শ্রীকৃষ্ণ বাস্তব। সেই বাস্তব নায়কের রাসলীলার রূপটি কিরূপ?

বঙ্কিম শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা থেকে রাসের অর্থ গ্রহণ করেছেন—'স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস।' বঙ্কিম তাই রাসকে একপ্রকার নির্দোষ আদিরসের নাম গন্ধহীন খেলা বলে গণ্য করেছেন এবং 'রতি' শব্দটি তাই সম্ভোগ অর্থে গ্রহণ না করে খেলা অর্থে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য হরিবংশের

শ্লোক থেকে রতি অর্থে খেলাই প্রতীয়মান হয়। আমাদের তাতে আপত্তি নেই; আমাদের শুধু প্রশ্ন, এই নির্দোষ আমোদ প্রমোদের নায়ক কে? যদি মানব কৃষ্ণই তার নায়ক হন, তবে সে খেলা খেলাতেই পর্যবসিত হওয়া উচিত, তার মধ্যদিয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা উঠলে প্রাকৃত নায়ককে নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।

বঙ্কিম বলেছেন: যুবক যুবতীর একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদিগের সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে—যথা ইউরোপে—নিন্দনীয় নহে। বোধ হয় যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে কাজটা নিন্দনীয়। সেইজন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,—"তা বার্যমাণা পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা," এবং সেইজন্যই অধ্যায় শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালণের জন্য লিখিয়াছেন—তিনি তাহাদিগের ভ্রাতৃগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ-রূপে সকলই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনি তিনিও সর্বভূতে আছেন।

এই ধারণার পর বঙ্কিম বলছেন: এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় ধর্মতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে, এবং কৃষ্ণের সময়ে বোধ হয়, সে সামাজিক দোষ ছিল না।

যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় আমরাও দোষ দেখি না, দোষ দেখি, যদি প্রাকৃত নায়িকা প্রাকৃত নায়ককে স্বামী বলে কামনা করে অথবা যদি রাসলীলায় এমন দৃশ্য দেখি যে,—

পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ।
কাচিৎ প্রবিল সদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্॥

প্রাকৃত নায়ক যতই পরিপূর্ণ হোন না কেন, এ দৃশ্য আপত্তিকর। এ দৃশ্যের একমাত্র দোষ ক্ষালন হয় নায়কের অপ্রাকৃততায়। ভাগবতকারের মানবকৃষ্ণ, তথা প্রাকৃত নায়কের ধারণা ছিল না। তিনি কৃষ্ণকে যেমন বুঝেছিলেন, অধ্যায় শেষে তেমনি লিখেছেন, যুবক যুবতীর রাসবর্ণনা করলেন বলে দোষ ক্ষালনের চেষ্টা

সেটা নয়। কিন্তু কৃষ্ণ এতে অমানবিক হয়ে যান, বঙ্কিম তাই মানবিক কৃষ্ণের ধারণায় একে দোষ ক্ষালনের প্রয়াস বলেই উল্লেখ করেছেন!

ভাগবতকারের বর্ণনায় কৃষ্ণের অশরীরী রূপই প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিম সে ক্ষেত্রে আপত্তি তুলে বলছেন: ঈশ্বর এখানে শরীরী এবং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানব-শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্মাবলম্বী হইয়া কার্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্মের পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্রী এবং তদভিগমন পরদারপাপ। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব পুরাণকৃত দোষ ক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ও নাই। ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাস মণ্ডল মধ্যে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

ভাগবতকারের শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিমানব নন, তাই তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন নন; এই অর্থে তিনি জিতেন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয়তাই তাঁর জিতেন্দ্রিয়তার কারণ। বঙ্কিমের কৃষ্ণ পরিপূর্ণ মানব বলে ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, এই অর্থে তিনি জিতেন্দ্রিয়। বঙ্কিম তাঁর ধারণা অনুযায়ী রাসলীলায় অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণের পরিবর্তে জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণের কল্পনা করেছেন, এতে রাসলীলার একটা লৌকিক ভূমিকা প্রকাশিত হওয়ায় গোপীদের দিক থেকে ইন্দ্রিয়গত সম্বন্ধবোধের সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই বঙ্কিম বলছেন: আর একটা কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ আছে, কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকে যদি অশরীরী বলে দেখি তবে রাসলীলা মাত্রেই উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতা। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কি উপপতিত্বে, কি পতিত্বে, কোনটিতেই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ নেই। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সেখানে রূপক মাত্র। ভাগবতকার বা পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ কেন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বর্ণনা করবার জন্যে এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির রূপক গ্রহণ করলেন, সে কথার বিচার পৃথক, সে হল শিল্পের বিচার; কিন্তু এই রূপকার্থ ভেদ করে যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পারবেন, তিনি বৈষ্ণব কাব্য-শাস্ত্র পাঠে অনধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র রাসলীলার মধ্যে শরীরী কৃষ্ণকে এনে একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের জিতেন্দ্রিয়তার কথা বলেছেন; অপর দিকে জয়দেব গোস্বামীকে গাল পেড়েছেন। কৃষ্ণ এবং রাধা-তত্ত্বের বিচারে বঙ্কিমের ভাব পারম্পর্যের এই একটা অসঙ্গতি আমরা দেখতে পাই। অসঙ্গতি এই কারণে,—তিনি ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষটাকে ধরতে চান, কৃষ্ণের যাবতীয় লীলাকে

মানব-রসে রসায়িত করে আস্বাদ করতে চান। কৃষ্ণকে ধর্মসাধকদের মত অপ্রাকৃত বলে কল্পনা করলে বঙ্কিমের ইন্দ্রিয়বোধ তথা রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের যে জগৎ-চেতনা তা তৃপ্তি পায় না। বলাই বাহুল্য, বঙ্কিমের ইন্দ্রিয়-বোধ ঔপনিষদিক শ্রেয়োতত্ত্বে প্রভাবিত। পরম তত্ত্বকে সমাজ মঙ্গলের রূপাদর্শে দেখেছেন বলে বঙ্কিম তত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রাকৃত ভূমি ত্যাগ করেন নি অথচ বুদ্ধি প্রাকৃত ভূমিকে অতিক্রম করে অপ্রাকৃত রহস্যকে স্পর্শ করছে এবং হয়তো বিশ্বাসও করছে, এমন আভাস তাঁর ধ্যানের গভীরতা অনুসরণ করলে পাওয়া যায়। তাই প্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব উভয়ের মধ্যে আপোষ করতে গিয়ে যুক্তির মধ্যে একটি ফাঁক থেকে গেছে। 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি, থেকে তাই এক দিকে যেমন বৈকুণ্ঠনাথের রূপকার্থ বার হয়েছে তেমনি অপর দিকে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের রূপকত্ব উপেক্ষিত হয়েছে! সেই অপ্রাকৃত রূপকতত্ত্ব অস্বীকৃত হওয়ায় বিচারে ভাবপারম্পর্যের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।

জিজ্ঞাসায় রত হয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে এই তর্কটুকু করলাম, তার অর্থ এই নয় যে, বঙ্কিমের চেয়ে আমরা বেশি জেনেছি, বেশি বুঝেছি। আমাদের আজকের রসিকতায় কি নির্গুণ ব্রহ্ম, কি সগুণ ব্রহ্ম, কি মানব-কৃষ্ণ, সবকিছু থেকেই আমাদের চেতনা মুখ ফিরিয়ে আছে। এসব কথা আমাদের কাছে বলতে এলেই আমরা আমাদের আধুনিক নানা বিদ্যাবুদ্ধির শিং বাগিয়ে গুঁতিয়ে দিই। এখানে আমাদের তর্কের অবতারণা এইটে বুঝে দেখবার জন্যে যে, বঙ্কিম পরিপূর্ণ মানবের কথা বলতে গিয়ে তার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছেন। কোনরকম পূর্ব সংস্কারের বশবর্তী হয়ে সেই পরিপূর্ণ মানবমূর্তির ওপর কুয়াশার প্রলেপ লাগিয়ে নেননি। বিরোধমূলক ক্ষেত্রে নূতন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা সর্বত্র হয়তো সফল হয়নি তবু বঙ্কিমের ধ্যানটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩

সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার জন্য আমাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা এমন খুব তীব্র নয়, যাতে সেই সাধনাকে আমরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি। বঙ্কিম যে সময়ের কথা বলছেন, সে সময়ে নানা বিকারে আমাদের জীবনটাকে এমন গাঁজিয়ে তুলেছে, নানা আঘাতে আমাদের জীবন এমন ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে যে সেখানে

পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজের সাধনা চলে না, সমস্ত জলটাই ঘুলিয়ে গেছে, তখন তাই স্বাস্থ্যের জন্যে পঙ্কোদ্ধারের প্রয়োজন।

বঙ্কিম তাঁর বেদনা-বোধে এই কথাটা স্পষ্ট করে বুঝলেন। তিনি তাই একেবারে প্রথমভাগ থেকে সুরু করলেন। জীবনের শ্লেটে কেমন করে দাগা বুলোতে হবে, কেমন করে কলম ধরতে হবে, শিষ্যের হাত ধরে গুরু সেটা দেখিয়ে দিতে চাইলেন। ভাল গুরুমশায়ের মতন, পাঠশালার ছাত্রকে দেখে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দাঁত মাজা হয়নি কেন, স্নান করনি কেন, জামাকাপড় কেন রয়েছে অপরিচ্ছন্ন? নিটোল মানুষ চেয়েছেন বঙ্কিম, প্রথমেই আমাদের স্বাস্থ্যের দিকে তাঁর নজর পড়ল। শরীর পুষ্টির জন্য ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে আচরণ করবার জন্যে বললেন। এই সঙ্গে আরও অনেক অপ্রিয় কথা বললেন। বললেন, "শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই, প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে,—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে"।

আহার সম্বন্ধেও বঙ্কিম গীতার নজির টেনেছেন। সমাজ-বিন্যাস যেমনই হোক না কেন, পরিপূর্ণতার আদর্শকে সামনে রেখে বঙ্কিম জীবনকে কৃষ্ণের উপদেশ অনুযায়ী বিন্যস্ত করতে চান। তাই একদিকে তিনি যেমন সাত্ত্বিক আহারের কথা বলেন, অপরদিকে তেমনি সাত্ত্বিক দানের প্রসঙ্গে আজকের সমাজ-বিন্যাস অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বাণী জীবনে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করবার একটা বেদনা বঙ্কিম অনুভব করেছেন এবং সেই বেদনায় শ্রীকৃষ্ণ-বাণীকে অনুসরণ করবার একটা যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিম আয়ত্ত করেছেন। বাঙলার নবজাগরণের ফলে আমরা যখন বৈদিক ক্রিয়াকর্ম, পৌরাণিক মূর্তিপূজা এবং সামাজিক নানা লোকাচারকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র বুদ্ধি ও বিচারের পথে চলছিলাম এবং ধর্মকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে দেখতে চাইছিলাম, বঙ্কিম তখন আমাদের চরিত্রের সেই যুক্তি-বাদিতাকে রক্ষা করেই পরিপূর্ণতার প্রতি একটা আবেগ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চাইলেন। আমাদের যে যুক্তিবাদ আবর্জনা সরাবার কাজে লেগেছিল, সেই যুক্তিবাদই পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করে চলেছিল। রাম-মহিমায়, কৃষ্ণচরিত্রে, ধ্রুব-প্রহ্লাদের কাহিনীতে সেই যুক্তিবাদই এনেছিল অবিশ্বাস। জ্ঞানের যে আগুনে আমরা অন্ধকার দূর করে প্রদীপ জ্বালাতে চাইলাম, সেই আগুনই

আমাদের কুঁড়ে ঘরটাকে দাহ্য পদার্থ জেনে তাকে ছারখার করে দিয়ে জীবনের পথে আমাদের যাযাবর করে দিলে। সেই যুক্তিবাদকে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার দিকে মোড় ফিরিয়ে তাকে একটা আবেগের অধীন করে দিলেন। তিনি একথা বললেন না যে, শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেই পূজা কর, তিনি বললেন, শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ মানুষ জেনেই ভক্তি কর। পরিপূর্ণতার ভূমিকায় ভক্তির তিনি তাই নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন,—যে চিত্তবৃত্তিতে আমরা পরিপূর্ণতাকে স্বীকার করি, তারই নাম ভক্তি। পরিপূর্ণতাকে স্বীকার করার অর্থ, তাকে জীবনে একান্ত জেনে আচরণ করা। ভক্তি তাই বিশ্বাসরূপে ধ্যানমূলক আর আচরণে ক্রিয়ামূলক। ধ্যানে, জ্ঞানে এবং কর্মে পরিপূর্ণতার প্রতি চিত্তের অভিমুখিতাই হল ভক্তি। ভক্তি অর্থে প্রতি মুহূর্তের চরিত্র প্রস্তুতি। ভক্তি তাই এক অভিনব জীবন-ব্রতে দীক্ষা; ভক্তি—আন্তর সাধনা।

শ্রীকৃষ্ণ বাণীতে যে চিত্ত-সাধনার কথা আছে, বঙ্কিম তাকেই পরিপূর্ণতার সাধনা বা ভক্তি বলে নির্দ্দেশ করেছেন ঃ

"যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত-সংযম, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, তাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে সে ভক্ত নহে।

ভক্তি অর্থে তাই চরিত্র-সাধনা। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে এই সাধক-চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। এই চরিত্রকেই বঙ্কিম মানুষেব আদর্শ চরিত্র বলে গ্রহণ করেছেন। যাঁর চরিত্র এইরকম পরিণতি লাভ করেছে তিনি কর্মের দ্বারাও বদ্ধ নন, জ্ঞানের দ্বারাও বদ্ধ হন না। তাঁর কর্ম নিষ্কাম কর্ম হয়ে ওঠে, তাঁর জ্ঞান ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটায়।

ধ্যানে, জ্ঞানে এবং কর্মে যখন পরিপূর্ণতাই আমাদের লক্ষ্য তখনই আমরা সাধক বা ভক্ত। যখন আমাদের ধ্যান ও কর্ম সেই পরিপূর্ণতার প্রতি উদ্দিষ্ট না হয়ে স্বার্থে প্রযুক্ত হয় তখনই 'আমাদের যাবতীয় দুঃখ, যাবতীয় বিকার। পরিপূর্ণতার অভিমুখী হলেই আমাদের জীবনের ভারকেন্দ্র ঠিক থাকে, নিজের দিকে আকর্ষণ করলেই সে ভারকেন্দ্র নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। পরিপূর্ণতার অভিমুখী হলে আমাদের বাসনা কামনাগুলি সুবিন্যস্ত হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই আমি

কতটা খাব, কতটা নেব, কতটা কাজ করব, তা বুঝতে পারা যায়। নইলে কোন একটা বিশেষ দিকে জীবনটা ঝুঁকে পড়লে অস্বাভাবিক স্ফীতির সৃষ্টি করে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আহারে, বিহারে, ভোগে, কর্মে, জ্ঞানে, ধর্মে আমরা বিকৃতির পাহাড় গড়ে তুলি। পরিপূর্ণতার সাধনায় আমাদের সেই স্ফীতি দূর করে সামঞ্জস্যময় জীবনলাভের কথাই বঙ্কিম বলেছেন। বঙ্কিমের ভক্তি কথাটা তাই নিছক পূজা-অর্চনার ব্যাপার নয়। ভক্তি অর্থে একটা সুসমঞ্জস চরিত্র লাভ। এইভাবে ঠাকুরবাড়ীর কাঁসরঘণ্টার কলরব ও নৈবেদ্য কলাপাতার আবর্জনা সরিয়ে বাস্তব জীবনবোধের পটভূমিকায় এনে ভক্তিকে বঙ্কিম দাঁড় করালেন। বলতে চাইলেন, আমাদের বাস্তব জীবন-সাধনার মধ্যেই পরিপূর্ণতার সাধনা করতে হবে। ঈশ্বর এখানে তাই কোন অতিলৌকিক তত্ত্বস্বরূপ নয়, ঈশ্বর সেই পরিপূর্ণতার আদর্শ। যদি পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে এ ঈশ্বরের চেহারায় মিল না হয় তো ক্ষতি নেই, আমার পরিপূর্ণতার আদর্শেই আমার ঈশ্বর আমার কাছে প্রতিভাত। কিন্তু অনধিকারীর কল্পনায় যদি সে আদর্শের বিকার ঘটে, বঙ্কিম তাই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকেই সেই পরিপূর্ণতার আদর্শ বলে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

পরিপূর্ণতাকে এইভাবে কৃষ্ণচরিত্রে নির্দিষ্ট করে দেখায় বঙ্কিমের জীবন-বেদ বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে নি বলে যদি কেউ আপত্তি তোলেন তা হলে সে ক্ষেত্রে বঙ্কিম-জিজ্ঞাসায় বিচারের প্রসঙ্গ পৃথক হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে আজকের জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে কেবল তর্কই করে যেতে হয়। কৃষ্ণ-চরিত্রের ব্যাখ্যায় যদি আজকের জীবন-জিজ্ঞাসার বহু সমস্যার সমাধান না মেলে, তাহলে বঙ্কিমের দৃষ্টি সাময়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন বলে অভিযোগ করে লাভ নেই, কারণ সে হিসাবে যে কোন শিল্পীর সাধনাকেই নাকচ করে দেওয়া চলে। বঙ্কিমের সময়ে যে সমস্যা ছিল না, বঙ্কিমের কাছ থেকে যদি তার সমাধানের নির্দেশ না পাই তবে সে জন্যে বঙ্কিমকে অস্বীকার করা চলে না। পরিপূর্ণতার সাধনায় বঙ্কিম যে ভক্তিতত্ত্বের কথা বলেছেন, আজকেও তা আমাদের সাধনাহীন জীবনে রূপ দেবার অপেক্ষা রাখে, বঙ্কিমের মানবকৃষ্ণকে মানি বা না মানি অথবা আজকের নানা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের নির্দেশ তাতে পাই বা না পাই।

সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার জন্যে অন্তরে বাহিরে সাধনাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে স্বীকার করে চলাই হল, বঙ্কিমের মতে, মানুষের ধর্ম-চেতনা। মানুষ

প্রবৃত্তির তাড়নায় এই সাধনা থেকে সরে যায়। এই সরে যাওয়ায় মানুষ অপরিণত, মানুষ ব্যর্থ, আর এই সাধনায় অধিষ্ঠিত থাকাতেই মানুষ পরিণত, মানুষ সার্থক। পরিণত মানুষের সেই সাধন-স্বভাবকেই বঙ্কিম মনুষ্যত্ব বলেছেন। ভক্তি কথাটার মধ্যে এই সাধন-স্বভাবের ধ্বনি থাকায়, কথাটির মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা রয়েছে। কথাটি তাই জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, যে কোন পরিবেশে প্রযোজ্য, যদিও সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার বিভিন্ন ধ্যান ও ধারণা অনুযায়ী ভক্তির লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে। সে মত-বিরোধের মধ্যে না গিয়ে আমরা শুধু বঙ্কিম কি বলতে চেয়েছেন, তাই দেখব। বঙ্কিম বলেন, সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা বলতে যদি মানুষের চার-প্রকার বৃত্তির, অর্থাৎ—শারীরিকী, কার্যকারিণী, জ্ঞানার্জনী ও চিত্তরঞ্জিণী—পরিপূর্ণ স্ফূর্তি বুঝায়, তাহলে সেই পরিপূর্ণতার প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই একটা আর্তি থাকা উচিত। এই আর্তিই হল ভক্তি। অথবা কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা চলে যে, সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার প্রতি ভক্তি জাগ্রত হলে মানুষের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্তি ঘটে। সম্যক স্ফূর্তি, অর্থাৎ যে স্ফূর্তি এমন কোন অস্বাভাবিক স্ফীতি নয় যাতে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এই অস্বাভাবিক স্ফীতির দিক থেকে বিচার করে বুঝতে হবে যে জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বা ভ্রান্ত লক্ষ্যের দিকে চলেছে কিনা। জীবনের সেই সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়াকেই বঙ্কিম বলেছেন ধর্ম-চেতনা। এই ধর্ম-চেতনায় নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির দমনে এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অনুশীলনে মানুষ পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে, কোন বৃত্তির কি মাত্রায় দমন এবং কি মাত্রায় অনুশীলন হবে, তা ছক কেটে বঙ্কিম বলে দেন নি, যিনি ভক্ত, যিনি সাধক, যিনি পরিপূর্ণ-তার পথিক, তিনি তাঁর নিজের জীবন-শিল্পে তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

এই জীবনবোধকেই বঙ্কিম বলেছেন ধর্মচেতনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনচেতনা

১

জীবনকে আমরা যখন স্বভাবের অধীন করে দেখি, তখন জীবনের ধ্যান ও ধারণা যেমন সহজ, রসিকতাও তেমনি গতানুগতিক। জীবনের এই স্বভাবানুগামিতাকেই অনেক ক্ষেত্রে আমরা সাহিত্যের রিয়ালিসম্ বলে ব্যাখ্যা করে থাকি, এবং যাঁরা স্বভাববাদী নন তাঁদের শিল্পের মূল্য বিচারে আদর্শবাদের অপবাদ দিই। কিন্তু সাহিত্যের Real যে কেবল স্বভাবকেই অনুসরণ করে, তা জোর করে বলা যায় না। স্বভাবের নানা বিকার, নানা গ্লানি যাঁদের চোখে পড়েছে, স্বভাবে যাঁরা সন্তুষ্ট নন, তাঁরা জীবনকে কোন একটা ধ্যানের অধীন করে দেখেন। সেই ধ্যানের আলোকেই জীবন তাঁদের কাছে বিশিষ্ট এক রিয়ালের মূর্তি পরিগ্রহ করে। সাহিত্যের রিয়াল বা বাস্তব তাই আপেক্ষিক। এই বাস্তববোধের দিক থেকে যদি কোন শিল্পীর সঙ্গে আমাদের মিল না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে শিল্পীকে গাল পেড়ে লাভ নেই। সে হিসাবে আমাদের জীবনবোধও তো পরিবর্তনশীল বাস্তবের ভূমিকায় আগামী কালের রসিকদের কাছে বদলে যেতে পারে এবং একই নিয়মে আমরাও তাঁদের কাছে প্রাচীন-পন্থী বলে আখ্যা পেতে পারি। তাই কোন মহৎ প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা হল, জীবনের কোন আনন্দ-মূর্তিটি তাঁর ধ্যানে উদ্ভাসিত হয়েছে, জীবনের কোন বেদনাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন, কি নিপুণ রেখায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন জীবনের সেই রস-রূপ।

কবিগুরু বলেন, "(প্রতিভার) দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা প্রীতিই সমগ্র করে দেখে।"

বঙ্কিম-জিজ্ঞাসাতেও এই প্রীতির অভাব হ'লে, আজকের জীবনবোধ দিয়ে বঙ্কিমের জীবন-চেতনার পরিচয় নিতে গিয়ে হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মনে কলহ ঘনিয়ে উঠবে। অনেক কিছুকে আমরা 'সেকেলে' বলে বাদ দিতে চাইব। হয়তো স্থিরভাবে সন্ধান করবার ধৈর্য থাকবে না। শ্রদ্ধার অভাবে শেষ পর্যন্ত একটা মুরুব্বীয়ানাই সার হবে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমও সচেতন ছিলেন। তাই "অনুশীলনতত্ত্ব" প্রসঙ্গে বঙ্কিম বললেন, "ইহা তুমি যে একবার শুনিয়া বুঝিতে

পারিবে এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয়তো, পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে; কিন্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না; দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও, কর্মক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে।"

"অনুশীলনতত্ত্বে" বঙ্কিম যে পরিপূর্ণ মানবের কথা বলেছেন, সে ধ্যানের কথা না বুঝেও আমরা বঙ্কিম-সাহিত্যে আনন্দ পেতে পারি। পরিপূর্ণতার রসিক বঙ্কিম জীবনকে প্রথমেই যে সুরে বেঁধে দিয়েছেন, প্রথমেই যে পরীক্ষামূলকভাবে তার একটা পথ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা নয়। পরিপূর্ণতার সব দিক প্রথমেই হয়তো একটা ভাল নক্সার মতন তাঁর চেতনায় ধরা পড়েনি। তবে কেমন যেন একটা সুর-জ্ঞান ছিল তাঁর, বীণা বাজাতে বসে বেসুরকে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম শ্রুতি দিয়ে ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। জীবনের যে সুন্দর রূপটিতে তিনি আনন্দ পেয়েছেন তা যখন ফুটিয়ে তুললেন, তখন তার মধ্যে কেমন একটা নিটোলতার আভাস ফুটে উঠল। চরিত্র সন্ধান করতে তিনি ইতিহাসের দিকে ঝুঁকলেন শুধু মাত্র বৈচিত্র্য-বিলাসের জন্যে নয়, একটা সুস্থ সুন্দর মানুষের সন্ধানের জন্যে। বঙ্কিমের গ্রন্থ পড়ে আমরা যারা বিলাস করেছি, তারা "বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" মুক্ত কণ্ঠের এই ঘোষণায় বড় বেশী পুলকিত ও অভিভূত হয়েছি। কতকগুলি গতানুগতিক জিজ্ঞাসাও আমাদের রসিকতার ওপর একটা জড়তার প্রলেপ বুলিয়ে রেখেছে। কুন্দ কেন বিষ খেল, রোহিনীকে কেন গুলি করে মারা হল, শৈবলিনী কেন অমন করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে—এই সমস্ত সমস্যাতেই আমাদের রসিকতা সীমিত। বঙ্কিমের রসিকতাটি আমাদের কাছে সব সময় ধরা পড়ে না বলে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসাকে আমরা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত দেখতে পাই না।

মান্দারণের দেবমন্দিরে বঙ্কিম তাঁর প্রথম রোমান্সের পর্দা তুললেন। জগৎ-সিংহের প্রচণ্ড করাঘাতে ঝড়ের সন্ধ্যায় সুন্দরী দুই রমণীর একমাত্র আশ্রয় গিয়েছে ভেঙে, দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গিয়েছে নিভে, সেই ভয়সঙ্কুল মুহূর্তে নারী দুজন শুনল:

"এই সশস্ত্র দ্বারদেশে বসিলাম, আমার বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। বিঘ্ন করিলে যদি পুরুষ হও তবে ফলভোগ করিবে; আর যদি স্ত্রীলোক হও তবে

নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও; রাজপুত-হস্তে অসি চর্ম থাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধিবে না।”

রোমান্স বই কি! বঙ্কিম বাঙলাদেশের সমস্ত নারীকে এই রোমান্স শোনাতে চেয়েছিলেন, সমস্ত পুরুষের মুখ দিয়ে এই রোমান্স বলাতে চেয়েছিলেন।

ছবিটা তাই খুব যত্ন করে এঁকেছেন বঙ্কিম:

“নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষ চক্ষুতে যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কথোপকথনের মধ্যে অকস্মাৎ পথিকেরও সেইদিকে দৃষ্টিপাত হইল, আর দৃষ্টি ফিরিল না। তাঁহার বোধ হইল যেন তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি আর কখনও দেখিতে পাইবেন না। যুবতীর চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত পথিকের চক্ষু সম্মিলিত হইল। যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন।”

নরনারীর প্রেমে পুরুষের কাছে নারীর দেহ-সৌন্দর্যের সহজ আবেদনের কথাই প্রথমে বলতে চেয়েছেন বঙ্কিম। রূপমোহের কথাই বলেছেন, কিন্তু বলতে চেয়েছেন, সেটা যেন সুস্থ হয়, বীরোচিত হয়। ভোগে যখন পুরুষ দুর্বল, লালসায় যখন স্থূল, তখন তার পরিবেশও পঙ্কিল। তখন নরনারীর চরিত্রে মহত্ত্বের অভাব। স্বার্থ তখন উদগ্র, লালসা তখন ক্লেদাক্ত, জীবন তখন জীর্ণ। মানুষ তখন ক্রূর, কপট, নিষ্ঠুর। বঙ্কিম বলবেন, মানুষ তখন পশু।

মোহের স্থূলতায় যে পশুস্বভাব—পরিপূর্ণতার সাধনায় সেই পশুস্বভাব থেকে মানুষকে উঠে আসতে হবে। তবেই তো নারী দিব্যকান্তি নিয়ে আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলবে, পুরুষ তার দিব্য চরিত্র নিয়ে কর্মের পথে এগিয়ে চলবে। নরনারীর সেই দিব্যরূপকে বঙ্কিম যেমন তাঁর ধ্যানে জাগ্রত করেছেন তেমনি দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন তাদের চোখে, মুখে দিয়েছেন দিব্য বাণী। তাদের যথাযোগ্য পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন।

নব্যবঙ্গের নানা ভাঙাগড়ার মধ্যে জীবনের পটভূমি যখন বিপর্যস্ত, যখন স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে একটা স্পষ্ট পরিণামের কথা বলা দুরূহ, পুরাতন সমাজ-বিন্যাস যেখানে দ্রুত অপস্রিয়মান অথচ নূতন কোন কাঠামো শক্ত হয়ে ওঠেনি, সেই সময় বঙ্কিম তাঁর ধ্যানের ধনগুলিকে কেমন করে সাজিয়ে আনলেন, কি কৌশলে তাদের বেদী নির্মাণ করলেন সেকথা ভাবলে আজ বিস্মিত হতে হয়। যা ছিল না, তাকে উপস্থিত করতে গিয়ে বঙ্কিম যে প্রতিভা প্রকাশ করেছেন, তাকে শুধুমাত্র রোমান্স-প্রীতি বলে মেনে নিলে যেন সে প্রতিভার সবটা ব্যাখ্যা হয় না।

নারী-প্রেম পুরুষের পৌরুষের একমাত্র কারণ না হলেও একটা অন্যতম কারণ। এই মূল তারটার ওপরেই প্রথমে ছড়ি টানলেন বঙ্কিম। মুক্ত কৃপাণ হস্তে পাঠান দলনে রাজপুত বীর জগৎসিংহ চলেছিলেন বিজয়-অভিযানে। প্রেম তাঁকে বিচিত্র ঘটনাবর্তের মধ্যে এনে ফেলল। মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে যিনি কতলুখাঁকে সুবর্ণরেখা পারে বিতাড়িত করার দুঃসাহস প্রকাশ করেছিলেন, তিলোত্তমার অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি সেই বীরের নয়ন থেকে নিদ্রা নিল কেড়ে। রাজপুত বীর অকপটে স্বীকার করলেন :

অদ্য মাসার্ধ মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতীত অন্য শয্যায় বিশ্রাম করি নাই। তোমার সখীকে দেখিয়া অবধি কেবল যুদ্ধেই নিযুক্ত আছি। কি রণক্ষেত্রে কি শিবিরে এক পল সে মুখ ভুলিতে পারি নাই, যখন মস্তকচ্ছেদ করিতে পাঠান খড়্গ তুলিয়াছে, তখন মরিলে সে মুখ আর দেখিতে পাইব না, একবার ভিন্ন আর দেখা হইল না, সেই কথাই আগে মনে পড়িয়াছে।

নারীর মোহ বীরপুরুষকে চঞ্চল করেছে কিন্তু পৌরুষের হানি ঘটায় নি। বীরপুত্র পিতার কাছে সেনাপতিত্বের ভার নিতে যেমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তেমনি তিলোত্তমার স্মৃতি-গৌরব নিয়ে প্রেমিক প্রতিজ্ঞা করলেন : এই শৈলেশ্বরের সাক্ষাৎ সত্য করিতেছি যে, তিলোত্তমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না।

একই চরিত্রের দুটি অধ্যায়—কর্ম ও প্রেম ; কর্ম যেমন কঠোর, প্রেম তেমনই আন্তরিক। বঙ্কিম প্রথম থেকেই অনুশীলনতত্ত্বের ছক অনুযায়ী অগ্রসর হন নি। তিনি প্রথমে প্রেম ও কর্মের একটা বড় ছবি আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কর্তব্যপরাঙ্মুখ ও স্বেচ্ছাচারী চিত্তের কাছে এর আবেদন নিছক আদর্শবাদিতার চেহারা নিয়ে লঘু হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে বঙ্কিমের কবি-কল্পনাকে রোমান্সপ্রিয়তা বলে আমরা খাটো করতে পারি, কিন্তু তাই বলে জীবনের এই অভিনব রোমান্স থেকে বঙ্কিম কোনদিন সরে আসেন নি। বস্তুত, পরিপূর্ণতার রসিক বঙ্কিম জীবনের বলিষ্ঠ রূপটি আঁকবার জন্যে ইতিহাসের দিকে ঝুঁকেছেন। সে শুধু রোমান্স-প্রবণতার জন্যে নয়। আমাদের তৎকালীন সমাজ জীবনের ভূমিকায় যে বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিকল্পনা বঙ্কিম করেছেন তা রোমান্টিক গল্প বলার জন্য নয়, করেছেন পরিপূর্ণতার রসিকতায়।

আমরা কিন্তু সাধারণতঃ গল্পটার দিকেই ঝুঁকেছি। ডিটেক্‌টিভ বই পড়ার আনন্দ-ঔৎসুক্য নিয়ে আমরা আমগাছের ওপর থেকে জগৎসিংহের বর্শা ছোঁড়া উপভোগ করেছি এবং 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—আয়েষার এই মুক্তকণ্ঠের ঘোষণায়

অনুরূপভাবে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছি। ফলে আমাদেরই রোমান্স-প্রীতির কাছে বঙ্কিমের প্রতিভা বোধ হয় কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে।

তবু জগৎসিংহকে বঙ্কিম সাধারণ মানুষের দোষগুণেই চিত্রিত করেছেন। গড়মান্দারণে সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুব্যূহর মধ্যে সে বন্দী, বিদ্যাদিগ্‌গজের অসম্পূর্ণ সংবাদ পরিবেশনে তিলোত্তমার প্রতি তার প্রেম দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াকুল। নানা ঘটনা-বৈচিত্র্য ও মনোজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জগৎসিংহ আবার কর্ম-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন, প্রেম-মহিমায় জাগ্রত হলেন, কাহিনীকার বঙ্কিম সেখানে নিপুণ মসী-চালনায় ঘটনা প্রবাহকে পরিণামের দিকে পৌছে দিয়েছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আয়েষা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমের জীবন-চেতনার গভীরে দৃষ্টিপাত করার অবকাশ আমাদের আছে। তিলোত্তমা এবং বিমলার সঙ্গে আমাদের যেন একটা পূর্ব পরিচিতি আছে। কিন্তু পাঠান নবাবের অন্তঃপুর-চারিণীর সঙ্গে আমাদের কি বাস্তব, কি স্বপ্ন কোন দিক দিয়েই পরিচয় ছিল না। ঘটনার স্রোতাবেগে বঙ্কিম আমাদের পাঠান দুহিতার নিভৃতলোকে নিয়ে গেলেন। সেখানে জগৎসিংহের রোগশয্যা থেকে আমরা দেখলাম, স্নেহে প্রেমে কল্যাণে নবারুণের রক্তিমায় উদ্ভাসিত, শুভ্র শতদলের লাবণ্যে বিকশিত, একটি বেদনামধুর প্রাণ জীবন বসন্তের দক্ষিণ পবনে হিল্লোলিত হচ্ছে। তার সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বভাব, রূপের সঙ্গে চরিত্র, এমনভাবে মিশেছে যে, সেই মিলনে এক অভাবনীয়তার প্রকাশ। এই অভাবনীয়তাই আয়েষা চরিত্রের রহস্য, এই অভাবনীয়তাই নারীর প্রতি পুরুষের চিরকালের উত্তর-না-পাওয়া জিজ্ঞাসা।

(নারীর দেহ-সৌন্দর্যের যে আবেদন পুরুষকে চঞ্চল করে, বার বার ঘা খেয়ে খেয়ে পুরুষ তা চিনে নিয়েছে; জেনেছে তার মানব-স্বভাবে তৃষ্ণা যে পরিমাণে দুর্দমনীয় নারীর রূপ সে পরিমাণে সত্য। নারীর এই রূপের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ ও তজ্জনিত চিত্ত-বিকার জীবনের একটা খুব পরিচিত অধ্যায়।) তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের চারি চক্ষুর মিলন সূর্যের সঙ্গে সূর্যমুখীর মিলনের মতই সহজ ও স্বাভাবিক। তার মধ্যে তৃষ্ণার সত্যতা আছে, আকাঙ্ক্ষার রহস্যময়তা নেই। তিলোত্তমার মধ্যে জগৎসিংহ রূপের সত্যকে দেখলেন। আয়েষার মধ্যে দেখলেন রূপের রহস্যকে।

রূপের সত্য জগৎসিংহকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের ঘাটের দিকে ধাবিত করিয়েছে। সে তৃষ্ণায় পাঠানের উদ্যত তরবারি ব্যর্থ হয়েছে। সে তৃষ্ণায় ভাল-মন্দ ভুলে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন বীর, যখন দাঁড়ালেন সেই রূপের সামনে,

চকিত হয়ে দেখলেন শত্রু পরিবেষ্টিত তিনি। তারপর সংগ্রামের অন্তে যখন মূর্ছা ভাঙল, তখন—

রাজপুত্র কষ্টে কহিলেন : আর একটি কথা, তুমি কে ?

রমণী কহিল : আয়েষা।

রাজপুত্র নিস্তব্ধ হইয়া আয়েষার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর কোথাও কি ইহাকে দেখিয়াছেন ? না, আর কখনও দেখেন নাই।

রাজপুত্র কেন, এ অভিনবকে ইতিপূর্বে বাঙলা সাহিত্যে আমরাও দেখিনি। আমাদের জীবনবোধের একটা গভীর রহস্য, আমাদের রূপানুভূতির একটা সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা, আমাদের রসোল্লাসের একটা শুভ্র শুচিতা, বঙ্কিম আয়েষা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নির্দেশ করলেন।

সাধারণত ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রানুসারে একে আমরা রোমান্স বলে থাকি। রোম দেশীয় প্রেমকথার ধাঁচ থেকেই রোমান্সের যে পরিচয়টি পণ্ডিতজনেরা নির্দ্দিষ্ট করেছেন তাতে সৌন্দর্যপ্রিয়তায় ও মাধুর্যের আস্বাদনে বাস্তব জীবনের নানা তুচ্ছতা ও রূঢ়তা থেকে পলায়নের কথাই আছে। প্রতিদিনের জীবনে যে গ্লানি দেখা দেয়, নানা সংঘর্ষে যে উত্তাপ, নানা বিরোধে যে বন্ধুরতা, তার মধ্যে অনেক সুর অনেক রঙ হারিয়ে যায়। সেই সুর আর রঙের তৃষ্ণায় মনটা মাঝে মাঝে উধাও হতে চায়। তখন রামধনুর মতন কোন একটা বর্ণ-বৈচিত্র্য, ঊর্ণনাভের মতন কোন একটা সূক্ষ্ম রেখাবিন্যাস, জীবনের কোন একটা বিশেষ রঙ্গমঞ্চে যদি ধরা পড়ে, তবে সাময়িকভাবে মনটা ছুটি পায়। It is a tendency, away from actuality —(Richardson)। মনে ভাবি, জীবনে এমনটি হয় না জানি, কিন্তু হলে বেশ হয়। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে যে বেদনা জাগে, সে বেদনা আমাদের জীবনের গভীরে নিয়ে যায় না, শুধু উপলাহত নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জনের মত জীবনের একটা লঘু চপল লীলায় সঞ্চারিত হয়।

Romanticism is something like a restless state of mind—it is the calling of the past—it may very often be the calling of the future—(L, Abercrombie)।

রোমান্সের মধ্যে তাই বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ জীবন-ধ্যানের কথা পাওয়া যায় না। ওতে ভাবের আবিষ্টতা আছে, আত্মবিস্মৃতিও আছে, কিন্তু ফলশ্রুতিতে গভীর কিছু প্রাপ্তি নেই।

It is the mysterious dim thinking with no definite desire

—(Stratchan)। অর্থাৎ রোমান্সের যে বেদনাবোধ তাতে আমরা পল্লবিত হই, বাইরে ছড়িয়ে পড়ি, ঘনীভূত হই না, ভেতরে ডুব দিই না। তাহলে এ বেদনা কি একটা বিলাস, এবং এই বেদনা-বিলাস কি যুগ ও জাতির একটা সাময়িক বিকার? উত্তরে গেটে বলেছেন ঃ

Romanticism, I should say, a disease while classicism, health.

বিকার যদি নাও বলি, তবু ব্যাধি বটে। কিন্তু কখন ব্যাধি? গেটের উক্তিটিকে সহসা গ্রহণ করতে মন চায় না। অপ্রিয় সত্য বলে মনে হয়। উক্তিটিকে তাই একটু প্রিয় করে নেব, কিছুটা তরল করে নিয়ে বলব, রোমান্টিসিজম এমন একটা পথ্য যেটা দুর্বলের পক্ষে নিষিদ্ধ, তাতে ব্যাধি কমে না, বাড়ে। কিন্তু সবলের পক্ষে? —তা জীবনোপলব্ধির লীলা-বিলাস।

রোমান্সের মধ্যে অভাবনীয়তার সুরটাই বড়, রহস্যময়তাও কিছু আছে কিন্তু সে রহস্য গভীরতার নয়, বৈচিত্র্যের। নব্যবঙ্গের যুবকদের কাছে বঙ্কিম রোমান্সের অবতারণা করেছেন জীবনের হাল্কা রঙিন ছবি উপহার দেবার জন্যে নয়, কারণ বঙ্কিম জানতেন দুর্বলের কাছে তা অপথ্য, জাতিকে সুস্থ করতে চেয়েছেন বঙ্কিম, জীবনের গভীরতর, পূর্ণতর ধর্মটি দেখাতে চেয়েছেন। রোমান্স তাই বঙ্কিমের বক্তব্য নয়, রোমান্স বঙ্কিমের পরিবেশ।

দেহ-সৌন্দর্যের চমৎকারিত্বেই আয়েষা তাই অভাবনীয় নয়, জীবন-ধর্মের গভীরতায় আয়েষা অভাবনীয়।

অন্তরে দিব্য প্রেম নিয়ে, দৃষ্টিতে অপার করুণা নিয়ে, হাত দুটিতে অক্লান্ত সেবা নিয়ে, শত্রুপুরীতে জগৎসিংহের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন কতলুতনয়া আয়েষা। চরিত্র-মহিমাই আয়েষার অভাবনীয়তা। সে রূপ দেখে জগৎসিংহের তিলোত্তমাকে মনে পড়ে। কিন্তু সে চরিত্রের কোন কূল কিনারা খুঁজে পান না। দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা নিয়ে ওসমান সেই রূপের দিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু মধুর কণ্ঠের উত্তর শুনি ঃ

ওসমান! ভাই-বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।

বন্দীশালায় এই চরিত্রেরই দৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা। এ প্রেম বড় অভিনব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ মহত্তের দেখা সব সময় মেলে না। সেখানে বাসনা-কামনার নানা স্থূলতা আছে, চাওয়া-পাওয়ার নানা হিসাব-নিকাশ আছে, ভালোর সঙ্গে মন্দের, স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের নানা বিরোধ আছে। এ প্রেমের সুরে বীণা

বাজাতে গেলে বীণাটিকে নিয়ে একলা পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সংসারে এ প্রেমের গান গাইতে গেলে বীণার তার যায় ছিঁড়ে, আশালতায় জল সিঞ্চন করাই সার হয়, লাভ-লোকসানের চেনা-জানা ফসলগুলো সে গাছে ফলে না।

ইংরাজী শাস্ত্রমতে এ প্রেম রোমান্টিক। বঙ্কিমের মতে আধ্যাত্মিক। রাত্রি-শেষের আকাশের তলায় বাতায়নের ধারে বসে আয়েষা যখন বিয়ের আংটিটি দুর্গ-পরিখার জলে ফেলে দিলেন, তখন সেই প্রেম ভোরের শুকতারা হয়ে পরম দিব্যতায় জ্বলজ্বল করতে লাগল।

প্রেমে আমরা পরিপূর্ণ হই; কথাটা ঘুরিয়ে নিলে দাঁড়ায়, পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাই হল প্রেম-চেতনা। এই আকাঙ্ক্ষাকে অনুশীলনতত্ত্বে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম প্রেম থেকে ভক্তিতে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই পরিপূর্ণতাকে যেমন ছক কেটে দেখিয়ে দেননি, প্রেম শব্দটিকেও নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেননি। কিন্তু স্নেহ, প্রেম, প্রণয় বা ভালবাসা—যে কোন শব্দই ব্যবহার করুন না কেন, একটা বিষয় অন্তত স্পষ্ট যে, বীরেন্দ্রসিংহের বহুগামিতা, কতলু খাঁর লাম্পট্য, ওসমানের মোহাবেশ, এসব থেকে স্বতন্ত্র আর একটি স্বভাবের কথা বিমলা, তিলোত্তমা, জগৎসিংহ ও আয়েষা চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিমলার পতিপ্রেম, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রণয়ানুরাগ, আয়েষার ভালবাসা গভীর খাতে বয়ে গিয়েছে। যে চিত্তবৃত্তি কঠোর সাধনায় ব্রতী করে, পুরুষকে মুক্ত-অসি-হস্তে সংগ্রামে লিপ্ত করে, তরুণী নারীকে সেবায় ও ত্যাগে মহিমান্বিত করে, দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম তারই বন্দনা গেয়েছেন।

আয়েষার মধ্য দিয়ে সেই বন্দনাই কোমল নিখাদে বেজে উঠেছে। "আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী"—প্রেমের এই ঝঙ্কারটিই আমাদের আবিষ্ট করে। বিমলার প্রেম, জগৎসিংহ-তিলোত্তমার অনুরাগ,—এই সুর-ঝঙ্কারে সে সবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ নিছক রোমান্টিক নয়, আধ্যাত্মিকও বটে।

কিন্তু ইতিহাসের জমকালো পটভূমিতে, ঘটনাবলীর বিচিত্র গতিভঙ্গিতে এবং কুঞ্চিত কেশরাশির তিমির-স্পর্শে এ প্রেমে রোমান্সের মীড়ই বেজেছে।

বঙ্কিম সাহিত্যের প্রথম পর্বে পরিবেশ রচনায় বঙ্কিম রোমান্টিক, কিন্তু বক্তব্যে নিশ্চয়ই গভীরতর কিছু রয়েছে। যুগের চাহিদায়, তাৎকালিক ইংরাজী-শেখা রসিকতায়, বাঙালীর চিরকালের ভাব-প্রবণতায় রোমান্সের শিল্পভঙ্গিই প্রতিভার পক্ষে সঙ্গত হয়েছে। কিন্তু প্রতিভার ওটাই স্বরূপ নয়। পেয়ালাটি রঙদার

কিন্তু পানীয়টি ভোলো না। নব্যবঙ্গের নতুন পাতা ডিনার টেবিলে হাল আমলের তৈজসপত্রই এনেছেন বঙ্কিম, কিন্তু তাতে পরিবেশন করলেন মদ নয়, দুধ। মিরাণ্ডা নয়, আয়েষা।

বাঙলার ছেলেমেয়েদের হাতে চীনে মাটীর পুতুল তুলে দিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চাননি বঙ্কিম। তিনি যা দিতে চেয়েছিলেন, তা পুতুল নয়, চরিত্র। রঙদার সাজ দেখে লোভীর মতন হাত বাড়িয়ে মনে হয় বুঝি বেশ খেলার জিনিষ পাওয়া গেল। কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখা যায়, সে খেলা আয়ত্বে নেই। পুতুল যদি ভাঙে তবে সেটা আর খেলা হয় না, বুকের শিরায় তখন টান ধরে।

গ্রামের ছেলে নবকুমার সখ করে সাগর মেলায় বেড়াতে গিয়ে ঘটনাচক্রে এমনই একটা পুতুল পেয়েছিল, ভেবেছিল জীবনের খেলায় এ বুঝি খুবই সহজ :

……'সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদু স্বরে কহিলেন', "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়-বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময় সময় এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণী কণ্ঠ-সম্ভূত স্বরে তা সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসার যাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল'।

পরম কোন প্রাপ্তির অভাবে জীবনের তটভূমিতে আমরা সবাই বোধ হয় পথ হারিয়ে বেড়াচ্ছি। বিশ্বাস করবার কেউ নেই, নির্ভর করবার কেউ নেই, আপন বলে দাবী করবার কেউ নেই। জীবনের চারপাশে মৃত্যুর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে, গহন অরণ্যের দুর্গমতায় আশ্রয় যখন একান্ত দুর্লভ, তখন জীবনের কোন পরম কাম্যের জন্য বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস জাগে, বুঝি মনে হয়, জীবনটা যদি সুরে বাঁধা হয়ে যেত, যদি একটা অখণ্ড রাগিণী হয়ে প্রকাশ পেত, এ সংসার-সমুদ্রে এই জীর্ণ জীবন-তরণীর যদি এক কাণ্ডারী পেতাম!

বঙ্কিম বললেন : প্রেমই সেই কাণ্ডারী। প্রেমই আমাদের পথ দেখিয়ে দেবে। পথ দেখাবে মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোয়, তরী থেকে তীরে।

এমনই এক প্রেমের জন্যে পুরুষচিত্তের বাসনাকে উদ্বেল করে তুলেছেন বঙ্কিম। কিন্তু জীবনে এ প্রেমের সংস্কার যে আমরা অনেক দিন হারিয়েছি। কালিদাসের যুগ থেকে আমরা যে বহুদিন নির্বাসিত।

হারিয়ে যাওয়া পথের সন্ধান পাওয়া যায় যে প্রেমে, সে প্রেম তাই অভাবনীয় হয়েই দেখা দিল বাঙলা সাহিত্যে। অভাবনীয়তার পটভূমি না হলে আমাদের জীবনে সে প্রেমের যোগ্য আধার কই ? লুব্ধ ওসমান বা মুগ্ধ জগৎসিংহের কাছে পাঠান দুহিতা আয়েষা তাই অভাবনীয়া। নবকুমারের কাছে কপালকুণ্ডলা একটা গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা। কপালকুণ্ডলা—বাঙলা সাহিত্যের নব বর্ষায় প্রথম পূর্বমেঘ। আয়েষার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনের দূরদিগন্তে পাঠানের নিভৃত অন্তঃপুরে যায় উদয়, নির্জন সাগর সৈকতে সন্ধ্যালোকের মায়া-মমতায় তারই বিস্তার।

আয়েষা এবং কপালকুণ্ডলা—সুরকার বঙ্কিমের একই ছড়ির টান ; বৈশাখী সন্ধ্যার একই বিদ্যুৎ চমক। নব্যবঙ্গের যাযাবর যুবকদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং বিচারকে নিরস্ত করে বঙ্কিম জীবনোপভোগের একটা প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করে দিলেন। ইংরাজী-সাহিত্য-চাখা রোমান্স-প্রিয়তা এবং নূতনত্বের অভিমানে বঙ্গের নবকুমারেরা তর্ক না করে দলে ভিড়ে গেল।

বঙ্কিম তখন অন্য কথা পাড়লেন।

২

সুন্দরের সঙ্গে যখন মোহের সম্বন্ধে পথে নামি, তখন তা' বাইরের পথ—রোমান্সের পথ। সে পথে বৈচিত্র্য আছে, গতি আছে, কিন্তু পরিণামে তা লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয় না।

পরিপূর্ণতার রসিক বঙ্কিম একটা লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিতে চাইলেন, তাই জীবনের ভেতরের পথটা দেখাতে চাইলেন বঙ্কিম। শুধু সৌন্দর্য-বিলাস নয়, চরিত্র তৈরীর কথাও বলতে চাইলেন।

রসিকতার পথ সাধন-পথ কিনা, সে নিয়ে হয়তো তর্কের অবকাশ আছে। বঙ্কিম কিন্তু বুঝেছিলেন, বাঙলার তরুণদের মধ্যে প্রাণশক্তি জাগাতে গেলে রসের কথা দিয়েই তাকে নাড়া দিতে হবে। সুন্দরের মোহেও যদি কিছুটা সাড়া জাগে।

নারী সম্বন্ধে যুগমানসে যখন অভব্য অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে, অসংযত রূপমোহ যখন উচ্চতর জীবনাদর্শের অভাবে প্রশ্রয় পেয়ে শান্তির নীড়গুলোকে তছ্‌নছ্‌ করে দিচ্ছে, বঙ্কিম তখন এমন সুন্দরের আরতি করলেন, নব রবিকরফুল্ল

জল-নলিনীর সঙ্গে যার তুলনা, সন্ধ্যা-সমীরণ-কম্পিত নীলোৎপল তুল্য ধীর মধুর কটাক্ষে যার প্রকাশ।

এরই জন্যে কি আমাদের মধ্যে একটা কান্না জাগে না! মনে কি হয় না, জীবনটা শুচি হোক, সুন্দর হোক,—সুরে বেজে উঠুক। আমাদের বাসনালোক থেকে সুন্দরের এমন ছবিগুলো আমরা কবে হারিয়ে ফেলেছি, ভাবের ভুবনে কত-খানি দেউলে হয়ে গেছি আমরা!

জীবনে বহুদিন হল যে অভিসার আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম, সুন্দরের বেদনায় বঙ্কিম আমাদের মধ্যে আবার তা জাগিয়ে দিলেন। অভিসারে নামালেন—কিন্তু শুধু বাইরের পথে নয়, ভেতরের পথটা বিশেষ করে দেখিয়ে দিলেন বঙ্কিম।

এই ভেতরের পথই বঙ্কিম সাহিত্যের জীবনভূমি। অনভ্যাসে এ পথ দুর্গম হতে পারে, কিন্তু ভুল পথ নয়। চলা অভ্যাস নেই বলেই বঙ্কিমকে বলি—নীতিবাদী, escapist; কিন্তু এ পথে চলবার স্বভাব তৈরী হলেই বুঝব, বঙ্কিম—সত্যবাদী, জীবনবিদ্।

বঙ্কিম কিন্তু কোন সঙ্কোচ বা অস্পষ্টতা রাখেন নি। বলেছেন,—এই ভেতরের পথ কাটবার জন্যেই লেখনী ধরেছি, ছেলে ভুলানো খেলনা তৈরীর জন্যে নয়।

কিন্তু এ পথ তো শুষ্ক তত্ত্ব-পথ নয়, এ জীবন-পথ—বেদন-বীথি। তত্ত্ব থেকে তাই জীবনে আসেন নি বঙ্কিম, জীবন থেকে তত্ত্বে গিয়েছেন—বেদনা থেকে সাধনায়—"গুরূপদেশকে শিক্ষা বলিতেছি না, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখবোধই প্রধান শিক্ষা।"

বঙ্কিম সাহিত্যে তাই বেদনার অশ্রুতে সাধনার পথ-নির্দ্দেশ। দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় বেদনা যত রঙীন, সাধনা তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু তারপর বেদনা দিয়েই সাধনার পথ কাটতে চাইলেন বঙ্কিম। বেদনাকে তাই তিনি এমনভাবে শাণিত করলেন যে জীবনের মর্ম্মমূলে বাসনার যে বিষবৃক্ষ গভীর পর্য্যন্ত শেকড় চালিয়েছে, তা যেন সমূলে ছেদন করা যায়। ক্ষুধার বিকারে যে জতুগৃহ জীবনের চারপাশে দেওয়াল তুলেছে তা যেন সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়,—এমন দাহিকা শক্তি এনে দিলেন সেই বেদনার।

রোগশয্যায় দেবেন্দ্রনাথ প্রলাপ বকতে লাগল—'পদপল্লবমুদারম্; গোবিন্দ-পুরের পথে পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে করতে নগেন্দ্রনাথ কামনা করতে লাগলেন মৃত্যুকে; নিদারুণ দুর্যোগের সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত শৈবলিনীকে নিতে হল প্রস্তরসজ্জা, কলিকাতার পথে পথে দীন ভিখারীর মত ঘুরে বেড়ালেন গোবিন্দলাল।

জীবনের এই পরিণামগুলির দিকে চেয়ে কেউ বা বঙ্কিমকে বেত্রধারী পণ্ডিত-মশাই মনে করেছেন, কেউ বা ব্যর্থ পরিণামের উপর একটা মহিমা অর্পণ করে বঙ্কিমের বিশেষ দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করেছেন।

বঙ্কিম কিন্তু বেত হাতে করবার আগে, অথবা ব্যর্থতার মহিমা-কীর্তন করার আগে, তত্ত্ব হিসাবে নয়, সত্য বলেই একটা কথা প্রথমে স্বীকার করে নিয়েছেন। তা' হল এই,—'সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে চিত্ত সংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না।'

চিত্ত-সংযমে প্রবৃত্ত হও—এটা জীবনের প্রথমভাগের নীতিকথা; দুরন্ত বালকদের ভালো না লাগাই সম্ভব। এই সম্ভাব্য বিরোধকে বঙ্কিম এক বেদন-বার্তা দিয়ে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। বেদনার সত্য থেকে যেন জীবনের তত্ত্বে অধিকার হয়। বেদনা যেন সাধনায় পৌঁছে দেয়!

বিষবৃক্ষের ছবি তাই খুব নিপুণ করেই আঁকলেন বঙ্কিম। নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, হীরা, রোহিনী—এদের অসংযম মুন্সীয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুললেন। বললেন: অসংযম প্রকট—তাই বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু জীবনের এই সহজ কথাকে আমরা মানতে চাইনি। শিল্পের বিরোধ তুলে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়েছি। সংযমের কথা যখন ভাল লাগেনি, শিল্পের তখন গলদ বার করেছি। জীবনের কথায় আনন্দ পাইনি, শিল্পের বিচারে মুরুব্বিয়ানা করেছি। বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা-আমাদের কাছে তাই আজ জীবন-জিজ্ঞাসা নয়, শিল্প-জিজ্ঞাসা মাত্র।

শিল্প-প্রসঙ্গ পরের কথা, জীবনের কথাটা আগে বুঝে দেখার চেষ্টা করি।

কামনার অসংযম;—বিষয়টা সমাজ সাপেক্ষ। সমাজকে যে হিসাবে স্বীকার করি, প্রেমে সংযম-অসংযমের দ্বন্দ্বও সে হিসেবে অনুভব করি। বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রেমের দ্বন্দ্ব সমাজ জীবনের কতকগুলি বিশেষ চিত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে। দাম্পত্য প্রেমের আদর্শই বঙ্কিম ক্যানভাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমাজ-বহির্ভূত কোনও জীবন-বিন্যাস কল্পনা করে [যে জন্যে শিল্পাদর্শের দিক থেকে তিনি বিশেষ-ভাবে ঔপন্যাসিক] প্রেমের কোন স্থায়ী পরিণাম নির্দেশ করেন নি। দাম্পত্য-জীবনই প্রেমের সমাজ সম্মত পটভূমি। বঙ্কিম মানসে এর আদর্শ হল এই যে, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পারের প্রতি পরস্পরের দেহে ও মনে একনিষ্ঠা। এই প্রেমে পুরুষকে নারীর দেবতা হয়ে উঠতে হয়, নারীকে সেই দেবপুরুষের সহধর্মিনী হয়ে

উঠতে হয়। প্রেমের এই দিব্যতায় জীবনের সামঞ্জস্য বিধান, ছন্দ রক্ষা ; অসংযত কামনায় এ আদর্শ থেকে সরে এলে বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। বলাই বাহুল্য, এ আদর্শে সমাজকে অস্বীকার করে কোন মোহ-মিলনের সমর্থন নেই।

কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের সীমার মধ্যেই কি জীবনের সকল সত্য ও রহস্যোপলব্ধি সম্ভব ?—এই হল নবীনের প্রশ্ন।

মোহের মধ্যেদিয়ে সুন্দরকে যে স্পর্শ করে যাই সে কি শুধু অসামাজিক বলেই নিন্দনীয় ?—এই হল প্রেমিকের জিজ্ঞাসা।

পরবর্তীকালের নবীন প্রেমিকেরা বঙ্কিম সাহিত্যে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হয় বঙ্কিমকে গাল পেড়েছেন, নয় ভুল বুঝেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বঙ্কিম-জিজ্ঞাসায় এ কলহ নিষ্প্রয়োজন। জীবনবোধের যেখানে মৌল পার্থক্য, সেখানে রসিকতারও তফাৎ ঘটে। সে ক্ষেত্রে জীবনের ধারণা নিয়ে একযুগের সঙ্গে অন্য যুগের কলহ চলতে পারে, কিন্তু রসাস্বাদনের কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের আজকের দৃষ্টিভঙ্গি দূরে রেখে বঙ্কিমের নিজের কথাটাই আগে বুঝে দেখি। দাম্পত্যপ্রেমের পটভূমিকেই স্বীকার করে নিয়ে দেখি, বঙ্কিম তাকে প্রেমের কি বিচিত্র দ্বন্দ্বে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

প্রেমে সমাজসম্মত ভোগজীবন স্বীকার করেছেন বঙ্কিম। যে-ভোগ অসামাজিক, দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন স্বীকার করতে চায় না যে মোহ, তাকে প্রেম বলে মর্যাদা দেন নি বঙ্কিম। কিন্তু যুগ তারপর বদলেছে ; দাম্পত্য জীবনাদর্শ ম্লান হয়েছে কিংবা গৌরবহীন গতানুগতিকতায় পরিণত হয়েছে। 'বিলাসের মতন স্বামী এবং নির্মলার মতন 'সতী' দেখা দিয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই অতি আধুনিকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করে দাম্পত্যজীবন বহির্ভূত প্রেম-বেদনাকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন। এ ধারণা ক্রমশঃ সংস্কারে পরিণত হয়েছে যে, প্রেম অবৈধ হলে তবেই বুঝি তাতে রঙ্ খোলে, সুর দোলে আর মন ভোলে ; মানব চরিত্রের রহস্যগুলো ধরা পড়ে। 'saddest' thought-এ song-টা sweetest হয়।

এ-হেন 'sweetest song'-এ পরিণামের কথাটা যদি কাণে বেসুরো লাগে তবে শিল্পীর ওপর আজকের জীবনভূমি থেকে রাগ করতে পারি ; বলতে পারি আমাদের জন্যে তিনি একটু জায়গা রাখেন নি কেন, তাহলে সমাজে সমর্থন ও প্রশ্রয় পেতুম। সেই রাগের মেজাজে বলতে পারি, পরিণামটা অপ্রার্থিত কিন্তু বলতে পারি কি, পরিণামটা অনিবার্য নয় ?

জীবন তৈরীর কথা, ভেতরের পথটার কথা বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন। তাই

পরিণামের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন তিনি। অসামাজিক যা, তা অবৈধ বলে মনে করেছেন এবং অবৈধ ভোগকে প্রেমের কোন মহিমা বলে বাজারে চালু করেননি। বলেছেন, চিত্তবৃত্তির অসামঞ্জস্যেই ভোগ অসামাজিক। অসামাজিক ভোগ অসংযম থেকেই প্রশ্রয় পায় বলে তাকে কোনমতেই সমর্থন করেননি। আবার ভোগ-বিরহিত কোন Platonic love-এ বঙ্কিমের আস্থা নেই। তাই কবি-জনোচিত সমাজ-জীবন নিরপেক্ষ কোন দার্শনিক মতবাদ প্রেম সম্পর্কে গড়ে তোলেন নি।

প্রেম-চেতনা এবং সমাজ চেতনা বঙ্কিম-মানসের একই উপাদান। বঙ্কিমের মতে, সমাজকে যখন অস্বীকার করি, তখন তার মূলে অন্য কিছু থাকতে পারে কিন্তু 'প্রেম' নেই। বঙ্কিম সেই 'অন্য কিছু'র রসিক ন'ন। গ্রাম্য কৌতুকের আড়াল দিয়ে সে ক্ষেত্রে বঙ্কিম বলবেন: "বয়স দোষে অমন হয়,...একটু কৈলে বাছুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনিয়াছি, তাহাতে বড় রস পরিপাক পায়।"

কিন্তু এর মূলে যে জীবন-সত্য, তা কৌতুক করে নয়, গম্ভীরভাবেই উপস্থাপন করেছেন বঙ্কিম। বলেছেন: "রূপ-দর্শন জনিত যে সকল চিত্তবৃত্তি তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ, পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক, প্রত্যহই তাহার একপ্রকারই বিকাশ। গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়।

কথাটা তত্ত্বকথা, না সত্য কথা? জীবনে যদি এটা দেখি এবং মানি, তখন এটা সত্য বলেই বুঝি; আর যখন মাধুকরী-বৃত্তির সমর্থন চাই, তখন বলি, এটা নীতিকথা।

এই সত্যই জীবনে বঙ্কিম নানা মূর্তিতে উজ্জ্বল করে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু এ সত্যকে আজ আমরা জীবনে স্বীকার করি না বলে বঙ্কিমমানসের এক বিশেষ ব্যাখ্যা উপস্থিত করি। বলি: বঙ্কিমচন্দ্র অনুভূতিকে তাহার নিজস্ব নিয়মে বিচার না করিয়া সমাজধর্মের সূত্রানুযায়ী তাহা নির্ধারণ করিতে চাহিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনুভূতিক সত্যের মানদণ্ডে অনুভূতিকে বিচার করেন নাই, আনুভূতিক সম্পর্ককে নীতিধর্মের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন।—[বঙ্কিমমানস— শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার]

রূপমোহ এবং প্রেম এ দুয়ের প্রভেদই শুধু অস্বীকার করিনা, একটাকে আনু-ভূতিক সত্য', 'বাস্তব সত্য' এই আখ্যা দিয়ে সাজিয়ে তুলি; আর একটাকে 'ধর্ম-সম্পর্কীয়' সত্য, 'নীতিগত সত্য', এমনকি 'অতিপ্রাকৃত, সত্য বলে উড়িয়ে দিতে

চাই। এক পরিবর্তিত সমাজ-বিন্যাসে অতি বাস্তব পটভূমিকায় মৌলিক কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্কিমমানসের এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয় যে,—"মনের ক্রিয়াশীল প্রবাহমান প্রকৃতির স্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রে নাই। তিনি আনুভূতিক সত্যকে মর্যাদা দানের জন্য অথবা নিরপেক্ষভাবে এই প্রবাহকে অনুসরণ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই।"

আনুভূতিক সত্য বা বাস্তব সত্য, যে নামই দিই না কেন, নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠার একটা ভাষা তাতে পাই মাত্র, মোহের গৌরব বাড়ে না, তার চরিত্র বদলায় না। 'প্রেম' ও 'রূপমোহ' এই দুই শব্দ ব্যবহার করে বঙ্কিম উভয়ের পার্থক্য বেশ স্পষ্ট করেই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে দেখিয়েছেন। বলেছেন বহুগামিতাই মোহ, একনিষ্ঠাই প্রেম। বহুগামিতা, শুদ্ধ ভাষায়, আধুনিক ভাষায়—'মনের ক্রম-বিকাশমান সৃষ্টিধর্মী পরিবর্তনশীল প্রকৃতি'; এ যদি আনুভূতিক সত্য বলে বিশেষ মর্যাদা পায়, তবে প্রেম বা একনিষ্ঠা যা আনন্দ চেতনায় জীবনের বাস্তব সত্য বলেই অনুভব করা যায়, তাকে আনুভূতিক সত্য না বলে নীতিধর্মের অনুশাসন হিসেবে দূরে সরিয়ে রাখব কেন? তবে কি বুঝব যে, প্রেমের বোধে বুদ্ধি অতিরিক্ত কোন আনন্দ চেতনা আজ আমরা অনুভব করি না বলেই বঙ্কিমকে না বোঝার ভান করছি অথবা অস্বীকার করার দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলছি?

প্রেম ও রূপমোহের কোন পার্থক্য যদি স্বীকার না করি, রূপমোহকেই একমাত্র সত্য বলে এবং প্রেমকে বাস্তবতা-বিবর্জিত আদর্শবাদ বলে যদি প্রচার করি, তবে আজকে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত নৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে কুন্দ ও রোহিনী চরিত্রের পরিণাম প্রসঙ্গে বঙ্কিম সম্বন্ধে আমরা এই অভিযোগ নিয়েই আসি।

কিন্তু বঙ্কিমের বক্তব্যটা কি আগে বুঝে দেখি। নগেন্দ্রনাথ তার স্ত্রী সূর্য্যমুখীকে বিস্মৃত হয়ে আশ্রিতা বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই আকর্ষণের কারণ বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম বললেন যে, এ প্রেম নয় রূপমোহ। বোঝাবার জন্যে হরদেব ঘোষালের পত্রে বললেন, সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ ছিল তা প্রেমধর্মের প্রবর্তনায়; কুন্দের প্রতি যে আকর্ষণ, তা মোহধর্মের বিভ্রমে। তবে এই মোহও পরে স্থায়ী প্রেমে রূপ নিতে পারে, এ কথাও জানালেন। কাজেই আনুভূতিক সত্যকে তথা মনের সৃষ্টিধর্মী প্রকৃতিকে বঙ্কিম অস্বীকার করলেন একথা বলা চলে না, কিন্তু একে প্রেম বলে বঙ্কিম মর্যাদা দেননি,

—সমাজনীতির দিক থেকে নয়, প্রেমেরই সত্য থেকে। দেবেন্দ্রনাথ যেমন অতিরিক্ত মদ্যপানে দেহের স্বাস্থ্য লঙ্ঘন করেছে বলেই পাপগ্রস্ত, তেমনি অসংযত লালসায় মনের স্বাস্থ্য লঙ্ঘন করেছেন বলেই নগেন্দ্রনাথ পাপাচারী। সূর্যমুখী যে তাঁর জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করে আছে, চিত্তের সাময়িক উত্তেজনায় নগেন্দ্রনাথ তা বুঝে দেখেননি। সূর্যমুখী যদি অভিমানে গৃহত্যাগ করে না যেতেন তবে নগেন্দ্রনাথের মোহ কুন্দকে ঘিরে ব্যস্ত থাকত, সূর্যমুখীর অভাব তিনি অনুভব করতেন না। কিন্তু ঔপন্যাসিক কৌশলে সূর্যমুখীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নগেন্দ্রনাথের পরিবর্তনকে তরান্বিত করেছেন। তখন—"দত্ত দিগের সেই সুবিস্তৃতি পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপসমুজ্জ্বল, বহুলোক সমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপান হইলে পর, অন্ধকার জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী সূর্যমুখী-নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেইরূপ আঁধার হইল। যেমন বালক চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া পুতুল ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী। ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতপুরী মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।

এরপর কুন্দের বিষপান কি এর চেয়ে মারাত্মক ঘটনা? কুন্দের এই মৃত্যুর চেয়ে সে মৃত্যু কি বেশি কালো? সে মৃত্যু তো ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য পরিণাম। সেখানে তো আর কোন বিস্মিত রহস্য নেই। রহস্য যা, তা হ'ল এই: "আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম?"

রূপমোহের এই চাঞ্চল্য ও বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনশীলতার জন্যেই তার বিষময় পরিণামের কথা বঙ্কিম বিশেষ করে বলতে চান। সমাজের অনুশাসনের দিক থেকে নয়, জীবনের সত্য পরিচয়ের দিক থেকে। ভোগবাদী বস্তুতন্ত্রের কাছে এ কথা নৈতিক আদর্শের শুষ্কতা ও রূঢ়তা নিয়ে দেখা দিতে পারে এবং প্রেম ও রূপমোহের পার্থক্য স্বীকার না করে বঙ্কিম সম্বন্ধে এ মন্তব্য-ও তখন সম্ভব হতে পারে যে,—"মানবিক সম্পর্ককে যথার্থ মানবিক সম্পর্ক দ্বারা বিচার না করিয়া অতিপ্রাকৃত সত্যের দ্বারা বিচারের প্রচেষ্টা তাঁহার শিল্প-ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার রক্ষণশীলতাকে প্রকট করিয়াছে।" [—বঙ্কিমমানস]

কিন্তু এ মন্তব্যে জীবনবোধের মৌল পার্থক্যটাই প্রকট হয় এবং তাতে বঙ্কিমের সঙ্গে কলহই সার হয়, বঙ্কিমমানসের সম্যক্‌ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় না বলেই আমাদের ধারণা।

বঙ্কিম কি বলতে চেয়েছেন, সে কথা তাই আগে বুঝে দেখি। বঙ্কিম বলেন, রূপমোহ ভালোমন্দের জ্ঞান হারায়, অসামাজিক হয়ে প্রকাশ পায়, সুখের সংসার ছারখার করে দেয়, জীবনে চতুর্দিকে বহ্নু্যৎসব রচনা করে,—তাই তা নিন্দনীয়।

বহুগামিতার এই চাঞ্চল্য বঙ্কিম নিন্দা করেছেন, সেইজন্যে কি বলতে চাই বঙ্কিম রক্ষণশীল, নীতিবাদী? কিন্তু যদি বুঝে দেখি বঙ্কিম কেন নিন্দা করেছেন, তাহলে সূর্যমুখী ভ্রমরের বেদনার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

—"সে হাসি আর নাই, সে চাহনি আর নাই, সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই, সে কথা কহার প্রণালী আর নাই···সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে, কার্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোনায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।"

রূপমোহের আপাতঃ রক্তিমার অন্তরস্থ কালিমা প্রেমের শুভ্র দ্যুতির কাছে খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন বঙ্কিম। প্রেমের একটা গভীর বক্তব্য ছিল বঙ্কিমের, জীবনের সত্য বলেই তাকে অনুভব করেছিলেন; তাই রূপমোহকে সমর্থন করেন নি। জীবনের সেই গভীরতর, পূর্ণতর সত্যের ধ্যানে বঙ্কিম যদি রক্ষণশীল বলে গালি পেয়ে থাকেন তবে বঙ্কিমের পক্ষ নিয়ে সে ক্ষেত্রে কলহ করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন। রূপমোহের পাশাপাশি প্রেমের সেই ধ্যানটি কেমন করে তাঁর শিল্পের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন, তা সকল কলহ মুলতুবী রেখে আমরা বুঝে দেখতে পারি।

বহুতে চাঞ্চল্যই রূপমোহ; দেহভোগই তার চাহিদা বলে একের মধ্যে সে তৃপ্ত নয়। কিন্তু শুধু দেহ নয়, আত্মার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে চায় বলেই প্রেম একের মধ্যে শান্ত, একের প্রতি তার নিষ্ঠা। বহু-রতিকে বলি মোহ, একনিষ্ঠাই হল প্রেম।

এ প্রেম নিছক তত্ত্বাদর্শ নয়, আনুভূতিক সত্য হয়েই জীবনে এ দেখা দেয়। প্রেমে যারা একনিষ্ঠ, তারা যে সমাজের শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে অথবা অন্ধ সংস্কার বা আদর্শের মোহবশে একনিষ্ঠা প্রকাশ করে একথা আমরা বলি না জীবনে এ-ও বাস্তব সত্য।

একনিষ্ঠাকে প্রেমের সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন, তাই দাম্পত্য-জীবনকেই প্রেমের যোগ্য আধার বলে দেখিয়েছেন বঙ্কিম। দাম্পত্য-জীবনের পটভূমিতেই

প্রেম ও রূপমোহের ভেদটি স্পষ্ট করে দেখানো সহজ হয়েছে। দাম্পত্যজীবন ছাড়া যে প্রেম নেই তা নয়,—আয়েষা, অমরনাথ, এবং প্রতাপে বঙ্কিম প্রেমেরই নানা রঙ্ দেখিয়েছেন। কিন্তু দাম্পত্যজীবন ছাড়া প্রেম সুস্থ-ভোগ-সম্মত নয়। ভোগ সামাজিক হলে তবেই তার স্বাস্থ্য বজায় থাকে। একনিষ্ঠ প্রেম যেখানে ভোগকে স্বীকার করে, এবং বঙ্কিমের মতে ভোগকে স্বীকার করেই প্রেম, ভোগ বাদ দিয়ে নয়,—সেখানে তাকে দাম্পত্যজীবনের আধারই গ্রহণ করতে হয়। সমাজ-সম্মত ভোগই একনিষ্ঠ প্রেমের ভোগ,—দাম্পত্যজীবনের আদর্শই একনিষ্ঠ প্রেমের আশ্রয়।

এই একনিষ্ঠ প্রেমের ধ্যানে প্রেম-চেতনা ও সমাজ-চেতনা বঙ্কিম-মানসের একই ভূমি। সমাজ-চেতনা—অর্থাৎ বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ-তত্ত্ব, বাইরের সঙ্গে অন্তরের সংযোগ-তত্ত্ব। প্রেমে ব্যক্তি ও বিশ্বে, অন্তর ও বাহিরে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান। রূপমোহে এই সামঞ্জস্যবোধ অন্তর্হিত। প্রেম তাই জীবনানুশীলনের একটি অন্যতম বৃত্তি ও শক্তি। দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া পাওয়ার ভূমিতে অনু-শীলনের এই বৃত্তি প্রেমরূপে প্রকাশিত; পরিপূর্ণতার ধ্যানে ও সাধনায় তা ভক্তিরূপে বিকশিত।

কিন্তু ভোগবাদের কাছে, মোহের কাছে, দাম্পত্যপ্রেমের মহিমা আদর্শবাদী, নীতিবাদী মনের রক্ষণশীলতা বলেই মনে হয়। বিশেষ, অবৈধ প্রেমের অনেক সুর ও রঙ্ যখন বাজারে চালু হয়েছে, তখন মাধুকরী বৃত্তিকে সমর্থন করার জন্যে বাস্তবের দোহাই পেড়ে ভোগজীবনের সহজ 'ফিলজফি' আমরা তৈরী করেছি। তাইতে সূর্যমুখী-ভ্রমরের বেদনার রঙ্ রোহিনী-কুন্দের বেদনার রঙের চেয়ে ফিকে বলে মনে হয়। বাসনার বহ্ন্যুৎসবের প্রখর আলোয় প্রেমের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে যায়। কামনার হাউই প্রণয়ের সন্ধ্যাতারার চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আলুলায়িত কুন্তলা, পদপ্রান্তে অবলুণ্ঠিতা, অশ্রুপরিপ্লুতা সেই প্রেমকে অত্যন্ত সুলভ জেনেই প্রত্যাখ্যান করলেন মোহ-বিভ্রান্ত গোবিন্দলাল। অভিমানী প্রেম পথ ছেড়ে দিল, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিল জীবনের সত্যকে—'মনে রাখিও একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে, মনে রাখিও একদিন তুমি খুঁজিবে এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়।'

বাসনা কামনার কোলাহলে প্রেমের এমন একটি কবিতা জীবন থেকে কখন হারিয়ে যায়! যে প্রেম গৃহ রচনা করে, সুখে দুঃখে যে প্রেম সংসার-সমুদ্র পাড়ি দেয়, জীবনকে সুস্থ করে, সার্থক করে যে-প্রেম,—স্বাদ পাইনি বলেই তা

বাস্তব বহির্ভূত আদর্শ নয়, আধুনিকতা বিবর্জিত জীর্ণতা নয়। মর্মের মৌনে এ প্রেমের গান আছে, কর্মের উৎসে এ প্রেমের ধ্যান আছে, ধর্মের সাধনায় এ প্রেমের চরিত্র আছে। একনিষ্ঠায় এ প্রেম কঠোর সংযমে ব্রতী,—তাই বুঝি অনাধুনিক ; আপনার নিভৃত মন্দিরে জীবনের লাস্য-লীলায় এ প্রেম অনবগুণ্ঠিতা —তাই জানি এ চিরন্তন।

দাম্পত্য-জীবনাদর্শই এ প্রেমের চরিত্র। দাম্পত্যজীবন তাই এখানে সামাজিক সংস্কার মাত্র নয়। এই প্রেমে স্বামী যেমন ইষ্টদেবতা, তেমনি ব্যক্তি হিসেবে সে যদি হত্যাকারী, অপরাধী, তবে প্রেমেরই সত্যরক্ষার জন্যে তার সঙ্গ নিন্দনীয়। দাম্পত্য সংস্কারের ঊর্দ্ধে সত্যকেই তখন আশ্রয় করে প্রেম। সেই সত্যাশ্রয়ী প্রেমের বেদনা-গম্ভীর পত্রটি বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমের একটি অমূল্য দান—

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই"।

প্রেম যেখানে একনিষ্ঠ নয়, সতী নয়, দাম্পত্যজীবন সেখানে সামাজিক সংস্কার মাত্র। সে জীবন যে কত দুর্বল লবঙ্গলতার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম তা দেখিয়েছেন।

অমরনাথের প্রতি লবঙ্গলতার অবচেতন মনের আকর্ষণই তার দাম্পত্যজীবনের ভিত্তিকে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করেছে। বাইরে লবঙ্গলতা অমরনাথকে যতই অস্বীকার করুক, তার উচ্চকণ্ঠে অন্তরের দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়েছে। মনের অবচেতনায় যে মোহ বাসা বেঁধে আছে তাকে নিন্দনীয় বলে জেনে লবঙ্গলতা বাইরে থেকে তাকে কবর দিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভিতরে তা যে অমর অঙ্কুরে উদ্ভিন্ন হতে চাইছে, প্রখর বুদ্ধিশালিনী আত্মসচেতন রমণী সেকথা জেনেছে বলেই আপনাতে আপনি চকিতা, ভীতসন্ত্রস্তা। সেই প্রণয়ভীতিই সতীত্বের আশ্রয়ে কঠোর বিতৃষ্ণার ছদ্মবেশ নিয়ে বৃথাই ভরসা পেতে চাইছে।

লবঙ্গলতা সেই প্রকৃতির নারী, অহংবোধ যার চরিত্রের মূল উপাদান। অহং-তৃপ্তিই তার জীবনোপলব্ধি। কুমারী জীবনে কৌমার্যের অহংকারেই প্রণয়ের

পূর্বরাগ প্রেমের দীপ্ত আলোয় ফুটে ওঠে না। প্রেমবোধের সেই দৈন্য বিবাহিত জীবনে সতীত্বের দম্ভে কিছুটা দূর হয়। এ সতীত্ব প্রেমের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, সামাজিক সংস্কার থেকে। কৌমার্যের আশ্রয় হারিয়ে অহং তখন সতীত্বের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়ে সবল হয়। কুমারী-জীবনে অহংয়ের প্রতিকূলতায় প্রেমে যে ব্যর্থ, বিবাহিত জীবনে সতীত্বের দম্ভে সে চরিতার্থ। এ সতীত্বকে তাই প্রতিকূল পরিবেশে প্রচার করতে হয়, প্রমাণ করতে হয়। তাই জলন্ত লৌহশলাকা দিয়ে পূর্বপ্রণয়ীর পিঠে চিরকালের কলঙ্ক দেগে দিতে হয়। কারণ কি?—না, তোমরা দেখ, আমি কত বড় সতী!

কিন্তু সেইজন্যেই সন্দেহ করি, নহ ঠিক খাঁটি। এ সতীত্ব নয়,—সতীপনা। অমরনাথের কাছে, তথা সমাজের কাছে আপনাকে সাধ্বী প্রমাণ করার চেষ্টা; পাছে অমরনাথের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃপা তার অন্তরের অসামাজিক আকর্ষণকে প্রমাণ করে। লবঙ্গলতার অবচেতন মনে অমরনাথের প্রতি আকর্ষণ যত প্রবল, অনুরূপ প্রাবল্যে অমরনাথের রূপতৃষ্ণাকে সে প্রতিহত করতে চেয়েছে। যে তৃষ্ণা নিজের মধ্যে অন্তঃস্রোতা, অমরনাথের মধ্যে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখে আত্মগোপনের তাই কি এত নিষ্ঠুর আয়োজন? অমরনাথ কি তার পিঠে শুধুমাত্র নিজের অপরাধের শাস্তি বহন করে বেড়াচ্ছে, আর একজনের অবদমিত তৃষ্ণাও কি সেই সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছে না?

লবঙ্গলতা বঙ্কিম পরিকল্পনায় আদর্শ স্ত্রী নয়। বঙ্কিম দেখাতে চেয়েছেন যে, লবঙ্গলতার মধ্যে সতীত্ব অহংভাবের দ্যোতক হয়ে দেখা দিয়েছে, একনিষ্ঠ প্রেমের রূপ নিয়ে আসেনি। একনিষ্ঠ প্রেমের অভিজ্ঞতা ওর নেই। বিবাহিত জীবনেও তার ভালবাসা স্বামীকে ঘিরে একনিষ্ঠ হতে পারেনি। নতুবা জন্মান্তরে অমরনাথকে পাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারত না, তার স্বামীকেই জন্ম-জন্মান্তরে লাভ করবার প্রার্থনা করত।

প্রেমের একনিষ্ঠা বা সতীত্ব, জীবনগত আনুভূতিক সত্য, সমাজ-নীতিগত নিছক সংস্কার মাত্র নয়। রজনীর মধ্যে প্রেমের এই আনুভূতিক সত্যই বঙ্কিম দেখিয়েছেন। প্রতিনায়ক লবঙ্গলতার কাছে রজনী তো বাইরের সবদিক থেকেই দীন, তবু রজনী যে-কাহিনীর নায়িকা, সেখানে লবঙ্গলতার মতন নারীকে উপস্থিত করলেন কেন বঙ্কিম? তাঁর বলার কথা এই যে, নারীর বিচিত্র শক্তিতে লবঙ্গলতা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকার মতই যৌবনচঞ্চল, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের গভীর উপলব্ধিতে অলঙ্কৃত রাত্রির মতই সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ অন্ধ নায়িকা রজনী।

অন্ধ নারীর রূপের জগৎ নেই, ধ্যানের জগৎই তার আশ্রয়। এই ধ্যানের অন্ধকারে যে দিব্যানুভূতি তার জীবনে নূতন এক আলোর জগৎ রচনা করেছে লবঙ্গলতার জগৎ থেকে তার অনেক প্রভেদ। বসন্ত-সখার একটি সুকুমার স্পর্শ তার অন্ধকার জগতে পরম জ্যোতি হয়ে দেখা দিয়েছে, সূর্য-চেতনায় জাগ্রত হয়েছে সে। সূর্য-স্বরূপ সেই সত্য, সেই প্রেম, তখনই শচীন্দ্রনাথকে স্বামিত্বে বরণ করে নিয়েছে—একনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কত দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে সেই নিষ্ঠার প্রকাশ। সে নিষ্ঠায় প্রেমের যে চরিত্র, লবঙ্গলতার মধ্যে তার একান্ত অভাব।

কিন্তু অবচেতনার গভীরে যে অবৈধ প্রণয়াশ্রু অহংদম্ভের পেষণে জমাট বেঁধে ছিল, অমরনাথের অপূর্ব আত্মত্যাগের রৌদ্র-দীপ্তিতে বিগলিত হয়ে সংস্কারের গ্রানাইট পাথরের ওপর দিয়ে তা অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীত রচনা করে বয়ে গেল। নারী যখন বুঝল, অমরনাথ তুচ্ছ নয়, দীন নয়, আপনার মহিমায় আপনি সমুন্নত এবং সেই মহিমা নিয়েই তার ভালবাসার জন্যে কাঙাল,—তখন একই সঙ্গে অহংয়ের ও প্রেমের কলহ জাগল তার মধ্যে। পরুষ কণ্ঠের প্রত্যাখ্যান ও নীরব অশ্রুর অর্ঘ্য, জীবন থালিকায় একই সঙ্গে সাজিয়ে নিয়ে এল, দর্পিতা, প্রেমমুগ্ধা লবঙ্গলতা।

৩

সতীত্ব-তাই প্রেমের চরিত্র, মোহের নয়। কুমারী, সধবা, বিধবা,—যে পরিচয়ই হোক না কেন, সতীত্বের অর্থ সবেতেই এক। কুমারী সে-সতীত্বে বিবাহরহিত-ভোগ থেকে বিমুখ; পরিণীতা রমণী একের প্রতি নিষ্ঠায় দাম্পত্য জীবনাদর্শে ব্রতী; বিধবার মধ্যে সে-সতীত্ব, অতীত স্মৃতির ধ্যান—মোহ-শান্তির মধ্যে আত্মার মুক্তি।

কিন্তু যে বিধবার জীবনে ভোগসুখ আদৌ হয় নি, অতীত স্মৃতির আশ্রয় যার নেই, তার কথা বঙ্কিম কি বলবেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। প্রেমের এক-নিষ্ঠাকে অনুসরণ করে বঙ্কিম যে জীবন-ধ্যানের কথা বলেছেন; তাতে 'বিধবার প্রেম' কথাটির মধ্যে একটা আপাতঃ বিরোধ উপস্থিত হয়। বিশেষ বঙ্কিম যখন বলেন, "যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনরায় পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাব বিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করেন না," তখন বঙ্কিম সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক

যে,—"কোন বিধবা যদি প্রকৃতই বিবাহ ক্ষেত্রে তাহার বিবাহের অধিকার প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্তানুয়ায়ী তাহাকে কোন ক্রমেই আর 'সাধ্বী' 'পবিত্রস্বভাব বিশিষ্টা' 'স্নেহময়ী' ইত্যাদি কোন বিশেষণেই ভূষিত করা যাইবে না।"

['বঙ্কিমমানস'—শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার]

কিন্তু সিদ্ধান্তটি একটু দ্রুত নয় কি? "স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি বিবাহ করেন না"—একথা সর্বদেশে সর্বকালে সত্য। এটা কোন বিশেষ সমাজের অনুশাসন নয়, এটা একটা হৃদয়গত সাধারণ সত্য। কিন্তু উক্তিটা বঙ্কিমের বলেই তাঁর একটা উল্টোমত আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি না কি?

তাহলে বঙ্কিমের মতটা কি?

সে ঐ 'আন্তরিক' শব্দটিতেই প্রকাশ পেয়েছে। এ একটি বিশিষ্ট চরিত্র। আন্তরিক, অর্থাৎ একনিষ্ঠ; একনিষ্ঠ প্রেম কখনও দ্বিতীয়কে আশ্রয় করে না। আমাদের মতন বঙ্কিম বিশ্বাস করেন না যে, একাধিক জনকে 'আন্তরিক' ভালবাসা যায়। তার অর্থ এই নয়, বঙ্কিম মনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন। পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে একজন বর্তমান থাকলেও মন অন্যত্র ধাবিত হতে পারে! বঙ্কিম তার সংজ্ঞা দেবেন রূপমোহ; 'আন্তরিক' বিশেষণটি সেখানে প্রয়োগ করবেন না।

একনিষ্ঠ প্রেমই আন্তরিক। একের বর্তমানে অথবা অবর্তমানে তা কখনও দ্বিচারিণী হয় না। যদি হয় তবে তাকে 'ভালবাসা' বলে প্রেমের নূতন ইজ্‌ম্ তৈরী করুন ক্ষতি নেই, আচারে আচরণে জীবনে তাকে প্রকাশ করুন, প্রচার করুন, বঙ্কিম বাধা দিতে আসবেন না। কিন্তু তাকে 'আন্তরিক' না বলাই ভাল। অপরিবর্তনীয়তাই আন্তরিকতা;—যা বাইরের জিনিস, তা পরিবর্তনের অধীন, যা অন্তরের জিনিষ, তা অপরিবর্তনীয়, সেইজন্যেই তা আন্তরিক।

আন্তরিক কথাটি বঙ্কিমের ধ্যানে তাই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। যা অন্তর্গূঢ় বিষয়, তাকেই বঙ্কিম বলতে চাইছেন আন্তরিক। অন্তর্গূঢ় বিষয়, অর্থাৎ যা বাহিরে পরিবর্ত্তনের সহসা অধীন হয়ে পড়ে না মনটাকে ভিতরে ভিতরে ভরিয়ে রাখে। তখন বাইরে নানা অভাব থাকলেও ভিতরে তথা অন্তরে কোন অভাব জাগে না। বাইরে পরিবর্তন হয় কিন্তু অন্তরে গূঢ়তার জন্যে, অন্তরটি গভীরতর তল পর্যন্ত ভরপুর থাকার জন্যে সহসা পরিবর্তন দেখা দেয় না। তাই বিশ্বাস, নির্ভরতা, শান্তি, অন্তরের এই গূঢ় গভীরতর তলেই সম্ভব। মন যদি

অন্তরের এই গূঢ় গভীর স্তরটিতে স্থিতিলাভ করে তবে যা মানসিক তা আন্তরিক হয়ে ওঠে।

যা অন্তরের মধ্যে আসন লাভ করে তার মূল্যবোধ যেমন বাইরের মাপকাঠিতে নয়, তেমনি বহির্জগতে তার অভাব হলেও মন যদি অভাব অনুভব না করে তবে অন্তরের আসন সে হারায় না। অভাববোধ থেকেই মন বিষয়ান্তরে লিপ্ত হয়। অভাব বোধ যেখানে নেই সেখানে বিষয়ান্তরে লিপ্ত না হওয়াটাও মনস্তাত্ত্বিক সত্য।

প্রেম আন্তরিক,—প্রেমে যখন এই অভাববোধটা নেই, ফাঁকটি নেই, সমস্ত মনটা ভরে আছে। প্রেম যদি অন্তরের গভীর তলটি আশ্রয় না করে তবে নিত্য অভাব বোধে [মোহ চরিতার্থতার পর যে অভাববোধ স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়] সে পীড়িত হয়, বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। এই আন্তরিকতার অভাবই বঙ্কিমের ভাষায় রূপমোহ এবং প্রেমের আন্তরিকতা, সেকালের ভাষায়, একনিষ্ঠা। এই একনিষ্ঠায় মন একের অবর্তমানেও কোন অভাব অনুভব করে না। প্রেম তখন স্মৃতিকে আশ্রয় করেই চরিতার্থ। মনস্তত্ত্বে স্মৃতির প্রভাব বস্তুর চেয়েও বেশী। প্রতিদিনের সান্নিধ্যে যাকে গতানুগতিক দেখি, দুদিনের বিচ্ছেদে তারই জন্যে আকর্ষণ প্রবলতর হতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে কি এমন কথা বলব, যে, মন কোন নীতির বশেই বিষয়ান্তরে লিপ্ত হচ্ছে না? যেখানে অভাববোধ, সেখানে বিষয়ান্তরে লিপ্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক ; যেখানে অভাববোধ নেই, সেখানে বিষয়ান্তরে লিপ্ত না হওয়াটাও আবার তেমনি স্বাভাবিক। তাই প্রিয়জনের মৃত্যুর পর স্মৃতিকে আশ্রয় করে মন যদি ভরপুর থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কোন অভাববোধ নেই বলে দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রশ্ন অবান্তর। প্রেমের একনিষ্ঠা বলতে বঙ্কিম হৃদয়গত এই সহজ সত্যটার কথাই সেকালের ভাষায় বোঝাতে চেয়েছেন। 'সাধ্বী' 'পবিত্রস্বভাব বিশিষ্টা' 'স্নেহময়ী' প্রভৃতি বিশেষণগুলি সে কালের ভাষায় অন্তর্গূঢ় এই সহজ সত্যটি প্রকাশ করার জন্যেই ব্যবহার করেছেন।

এমন আন্তরিকতায় আজ আমরা বিশ্বাস না-ও করতে পারি, কোন বিশেষ ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন নীতিবাদী মনের গতি-ধর্মহীন (static) আদর্শবাদ বলে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু তবু এ কথাও জানি, এ আন্তরিকতা আমাদের জীবনে বাস্তব সত্য হয়েই দেখা দেয়। সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, রজনী,—শচীন্দ্র, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর,—এঁরাও আমাদের ঘরে ঘরে আছেন, এবং আছেন বলেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আপনা থেকেই আমাদের জীবন অনুশীলিত হয়ে বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্র-যুগের পথ বেয়ে ভাবীকালের দিকে এগিয়ে চলেছে।

অন্তর যদি ভরপুর না থাকে তবে মন যে ভিন্ন পাত্রকে আশ্রয় করতে চাইবে, সে আর বিচিত্র কি? সে ক্ষেত্রে বালবিধবার বিবাহকে বঙ্কিম কিভাবে স্বীকার করেছেন তা বুঝে দেখা দরকার। আমরা যদি একথা মনে করি যে বিধবা বিবাহে ইচ্ছুক হলেই পূর্ব প্রণয়ীর প্রতি আন্তরিকতার অভাব হেতু, এবং সেই জন্যে রূপমোহ হেতু বঙ্কিম তাকে নিন্দনীয় বলেছেন, তবে বঙ্কিমের ভাবনার যথাযথ পরিচয় দেওয়া যাবে না। আন্তরিকতার অভাব মোহের জন্যে, চিত্তের চাঞ্চল্যের জন্যে হতে পারে, আবার অনভিজ্ঞতার জন্যেও হতে পারে। অনভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বঙ্কিম বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন?

বিধবাবিবাহকে বঙ্কিম সমর্থন করেন না যদি তা রূপমোহের চাঞ্চল্যকে প্রশ্রয় দেয়। বঙ্কিম বলতে চান না যে, কোন বিধবা বিবাহে ইচ্ছুক হলেই সে ইচ্ছা রূপমোহ সঞ্জাত; কিন্তু রূপমোহে যদি কেউ বিধবা বিবাহের সুযোগ নিতে চায় তবে মোহ-অন্তে তার দুর্বিষহ বোধ হতে পারে। সেই সম্ভাবনার জন্যেই তা ক্ষতিকর এবং নিন্দনীয়। অথচ প্রেম অন্তর্গূঢ় বিষয়, শুধুমাত্র শারীর-মিলন মাত্র নয়।

বঙ্কিম তাই বলেন,—"বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।"

বিধবাবিবাহ—বঙ্কিম চেতনায় এ প্রশ্নের সমর্থন ও অসমর্থন তাই প্রেম ও রূপমোহের ভূমিকায়। রূপমোহের, তথা অসংযত ভোগের যদি প্রশ্রয়, তবে বিধবা বিবাহে ক্ষতির বোঝাই বেশী, তাই তা অসমর্থনীয়। যদি বঞ্চিত জীবনে প্রেমের অরুণোদয়, তবে বঙ্কিমের মতে, "বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।"

কুন্দ ও রোহিণী—এই দুই চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তাঁর কথা জানিয়েছেন। প্রেম ও রূপমোহের ভেদে-ই কুন্দ ও রোহিণীর ভেদ। কুন্দ ও রোহিণী বঙ্কিম-মানসের একই তত্ত্ব প্রকাশ করে না। উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট পার্থক্যটি যদি বুঝতে না পারি, তবে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতের ভুল ব্যাখ্যাই করব।

রোহিণীর কথাই প্রথমে বুঝে দেখি। রোহিণী সম্বন্ধে আমরা বঙ্কিমের বিরুদ্ধে যে অবিচারের অভিযোগ নিয়ে আসি তার কারণ রোহিণীর জন্যে আমাদের মনে একটা প্রবল সহানুভূতি আছে। রোহিণীকে আমরা বঙ্কিমের দৃষ্টিতে না দেখে তার বঞ্চিত জীবনের বেদনায় কারুণ্যের রঙে তাকে খানিকটা রাঙিয়ে নিই, খানিকটা সৃষ্টি করে নিই। সেই মমতায় রোহিণী তখন আমাদের কাছে ভ্রমরের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন গোবিন্দলালের মতন আমরাও যেন রোহিণীর প্রতি কিছুটা মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ি। ভুলে যাই, ভ্রমরের সর্বনাশ করছে, এ কথা জেনেই রোহিণী ভোগের পথে পা বাড়িয়েছে। গোবিন্দলাল তার আশার অতীত, আশা করেছিল হরলালকে। হরলালের প্রস্তাবে তাই গোপন আশায় অন্তরে অন্তরে উল্লসিত হয়েছিল, উইল চুরির দুঃসাহসিকতায় অগ্রসর হয়েছিল। তারপর যখন দেখল হরলালের লক্ষ্য রোহিণী নয়, টাকা, তখন বারুণীর ঘাটে কলসী ডুবিয়ে কাঁদতে বসল।

রোহিণীর এই কান্নাটুকু আমাদের মন কেড়ে নেয়। বঙ্কিম শিল্পের প্রয়োজনে এখানে কৌশলে রোহিণীর বেশ পরিবর্তন করিয়েছেন। নায়ক-চরিত্রের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তার লালসা যাতে নগ্ন হয়ে প্রকাশ না পায়, গোবিন্দলালের মোহের যেন একটা কৈফিয়ৎ থাকে, সেইজন্যেই রোহিণীকে একটু সাজিয়ে তুলেছেন। রোহিণীর বঞ্চিত জীবনের বেদনাকে বিশ্বের অনন্ত না-পাওয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন, কুহুধ্বনিতে বাজিয়ে তুলেছেন। নারী তখন যৌবন-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, রূপগৌরবে স্বীকার্য, এবং বঞ্চিতের বেদনায় সহানুভবনীয়া। এই সজ্জাটুকু না হলে ভ্রমরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রোহিণী দাঁড়াতে পারে না। শিল্পের প্রয়োজনেই রোহিণীর এই বেশভূষা। এ সজ্জা সবটাই বাইরের।

এই বাইরের সজ্জায় মোহগ্রস্ত না হয়ে রোহিণীর যে চরিত্র-চিত্রটি বঙ্কিম কৌশলে আভাসে ইঙ্গিতে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেটা বুঝে দেখার চেষ্টা করি।

গভীর নিশীথে কৃষ্ণকান্তের নির্জ্জন কক্ষে উইল চুরির উদ্দেশ্যে নিপুণ পদসঞ্চারে একটি কথাই আমাদের মনে হয় যে, এ নারী বড় দুঃসাহসিক, আপনার আত্ম-প্রত্যয়ে অত্যন্ত শক্তিমতী। যে কাজ একজন পুরুষের পক্ষে অসাধ্য, রোহিণীর পক্ষে তা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। রোহিণীর এই আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে একটি মাত্র বৃত্তিই প্রবল—সে একান্তভাবে রূপ-সচেতন। রূপ-গৌরবই তার সকল শক্তির মূল। কটাক্ষ-নিপুণা রূপ-সচেতন এই নারী রূপ-প্রেমিক পুরুষকে অন্তরের ক্ষেত্রে দুর্বল বলেই জানে। এইজন্যে পুরুষের দুর্বলতায় সে তৃপ্ত, তাই পুরুষের পৌরুষ

যেমন সে জাগাতে পারে না, পুরুষের কাছে প্রেমিকা নারী হয়ে উঠতেও পারে না; রূপের আলোয় পুরুষকে আকর্ষণ করে অথচ তার জন্য স্থায়ী আশ্রয় দিতে পারেনা। অন্তরে তার অতৃপ্তিই প্রবল। সেই অতৃপ্তি থেকে নিত্য নূতন শিকার ধরার বৃত্তিই অবচেতনায় বাসা বেঁধে আছে। হাস্যে, লাস্যে, প্রসাধন-নৈপুণ্যে সেই অন্তঃসার শূন্যতারই প্রকাশ। তাই অন্তরে সে বড়ই দীন। বাইরের চাঞ্চল্যে এ দৈন্য ঢাকা থাকে মাত্র, রূপের গৌরব সে দৈন্য দূর করতে পারে না।

রোহিণীর এই চিত্ত-দৈন্য বঙ্কিম কৌশলে আড়াল করে রেখেছেন। আভাসে ইঙ্গিতে কিছুটা পরিচয় দিলেও শিল্পের প্রয়োজনেই তাকে প্রথম থেকে প্রকট করে তোলেন নি। রোহিণীর অন্তঃসারশূন্য চিত্তের লালসাসিক্ত গহ্বরে গোবিন্দলালের পদক্ষেপটি যাতে সুনিশ্চিত এবং কৈফিয়ৎ যুক্ত হয়, সে জন্যে রোহিণীর বাইরের সাজসজ্জা উজ্জ্বল করে তুলে পরিবেশ সুবিন্যস্ত করেছেন।

এই বাইরের প্রসাধন গড়েছে যেমন, ভাঙবেও তেমনি। সে-যৌবনের দিকে তাকিয়ে গোবিন্দলাল যখন নূতন কিছু আর পাবে না, তখন বাসনার সেই বিকার থেকে মুক্তি চাইবে না কি? যখন আগের জীবনের সঙ্গে তুলনা করবে, তখন রোহিণীকে ফেলে যাওয়ার একটা ছুতো খুঁজবে না কি? তখন রোহিণীর স্বভাবের কোন একটা ত্রুটিকে অপরাধ বলে ধরে নিয়ে যদি পিস্তলের গুলি ছোটে তবে সেটা কি খুব বেশি বিস্ময়ের!

কুন্দের প্রেম কিন্তু ধর্মানুভাব সঞ্জাত। তা পাপ নয়, পাপাচারী নয়। জীবনের এই সুকুমার উপলব্ধি তাকে শুচি করেছে, বাসনার বিকারে কুচক্রী করে তোলেনি। বঙ্কিম অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়ে এই পুষ্পপ্রায় রমণীর কোমল অন্তরের বেদনাকে চিত্রিত করেছেন। সর্ব্বদাই তাকে দুঃখী, অনাথিনী, সরলা বলে অভিহিত করেছেন, নির্বোধ বলে তাকে সস্নেহ অনুযোগ করেছেন। আর একজনের সুখের সংসারে ভাঙন ধরেছে, তাই 'কালামুখী' বলে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু তার প্রেমকে বারণ করেন নি। কুন্দের প্রণয় অসামাজিক, কিন্তু অসামাজিক বলেই তা ঘৃণ্য নয়। আর ঘৃণ্য নয় বলেই কুন্দ—"কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল।......ভালবাসা কাহাকে বলে সোনার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল।"

প্রেমানুভূতির দিক দিয়ে রোহিণী ও কুন্দের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখিয়েছেন বঙ্কিম। পরিণাম বাহ্যত মৃত্যু হলেও তার ফলশ্রুতি এক নয়, রোহিণীর মৃত্যুতে কামনার বিকার—অন্তর তাতে শিউরে ওঠে। কুন্দের মৃত্যুতে প্রেমেরই ধ্বনি —জাগে বেদনার গান।

বিধবার প্রেম কাকে আশ্রয় করে ধন্য হবে বঙ্কিম-বেদনার এই তো জিজ্ঞাসা। চঞ্চল লালসা এ কুন্দ পুষ্পকে শুধু অসম্মানই করে, এর আশ্রয় হতে পারে না। ঝরে যাবার জন্যেই বুঝি এ ফোটে, দীর্ঘনিঃশ্বাসের বৃন্তই বুঝি এর আশ্রয়!

বিধবার বিবাহ সমস্যার নয়, প্রেমের যোগ্য আধার পাওয়াই সমস্যার। চরিত্রবান উদার হৃদয় যুবকের পক্ষে বিধবার প্রেমের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হলে তা থেকে সুস্থ সমাজ হয় তো গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু সূর্যমুখী-ভ্রমরের মত স্ত্রী ত্যাগ করে বিধবাবিবাহের সুযোগ নিতে চায় যারা, তারা সুস্থ দাম্পত্যজীবন গড়ে তুলতে পারে না বলেই বঙ্কিম সে বিবাহকে নিন্দা করেছেন।

প্রশ্ন তুলতে পারি, তেমন কোন সুস্থ দাম্পত্যজীবনের ছবি আঁকলেন না কেন বঙ্কিম?

উত্তর দিতে পারি এই বলে যে, বঙ্কিমের কবি-কল্পনা জীবনের তেমন কোন চিত্রে বিশেষ স্ফূর্তির অবকাশ পেত না। পরিপূর্ণতার রসিক বঙ্কিম জীবনের দ্বন্দ্ব-গুলিকে তারই ভূমিকায় আবিষ্কার করেছেন। প্রেম ও রূপমোহের দ্বন্দ্বে মোহ-শান্তিই তাঁর বক্তব্য;—নারীর সতীত্ব এবং পুরুষের পৌরুষই তাই তাঁর প্রেরণা। বঞ্চিত বিধবার জন্য নীড় রচনার দ্বন্দ্ব তিনি তাই বিশেষ অনুভব করেন নি। রক্ষণশীল বলে নয়, জীবনের অন্য কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য ছিল বলে। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা বিধবার জীবনে যে সামাজিক প্রতিকূলতা তখন বর্তমান, তাতে বঙ্কিমের কবি-কল্পনা, —পরিপূর্ণ মানবতার ধ্যান—তার মধ্যে দিয়ে সহজে প্রকাশ্য নয় বলেই প্রেমিকা বিধবা নায়িকা-মূর্তিতে বঙ্কিমচেতনায় উদ্ভাসিত হয় নি। যদি শিল্পের জুলুম চালিয়ে ফরমাস মাফিক কিছু তৈরী করতেন, তবে তা কল্প-কথা এবং গল্প-কথা হত; উপন্যাস হত না,—'বাস্তব' হত না।

পরবর্তীকালে যখন সমাজ বিন্যাস গেল বদলে, তখন দরদী শিল্পী সাহিত্যেও বিধবার প্রেম-বেদনার বিচিত্র ছবি আঁকার অবকাশ পেলেন। তবু বেদনার কথাই বললেন শরৎচন্দ্র, বিধবার কোন সুস্থ দাম্পত্যজীবনের চিত্র শরৎচন্দ্রও দেখান নি। সমাজের বাইরে সুদূর বর্মামুলুকে অভয়া জিজ্ঞাসা হয়েই পরিণতি লাভ করেছে।

বিদ্রোহ করে কিছু একটি অসম্ভব অবাস্তব জিনিষ উপস্থিত করা শিল্প-সম্মত

নয়, শিল্পীর চরিত্রও নয়। শিল্পী শুধু বেদনার সমর্থন রচনা করতে পারেন; প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পথ শিল্পের পথ নয়। মনের গতি ও প্রেমের সহানুভূতির সঙ্গেই শিল্পীর কারবার। তাই গতি তাঁর বিপ্লবীর মত দ্রুত নয়, কিন্তু তাঁর শিল্পের ফল নিশ্চিত, সামগ্রিক এবং স্থায়ী।

তাই কুন্দের বেদনা থেকেই রাজলক্ষ্মী-রমা-মাধুরীর কথা শোনবার কাণ তৈরী হয়, মন উদার হয়। বঙ্কিম এ প্রসঙ্গে কুন্দের বেদনার মধ্য দিয়ে সুর বেঁধেছেন মাত্র, অন্য বক্তব্য ছিল বলে সে সুরের বিস্তার আর তাঁর সাহিত্যে নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র এইখানেই তার বীণাপাণির আসনখানি পেতেছেন।

কাম যখন মানবিক বৃত্তি, তখন বঙ্কিম চেতনায় তার স্বীকৃতি নিশ্চয় আছে। মোহের প্রতি নিষ্ঠুর অক্ষমা ছিল না তাঁর, রক্তমাংসের একটা সত্য উপাদান বলে তাকে মেনেছেন বঙ্কিম। কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছেন যে, তা যেন আত্যন্তিক স্ফুর্তি না পায়। তা হলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। এই ক্ষতি তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসায় একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। অমরনাথের জীবন-দ্বন্দ্বে সে প্রশ্নটি যখন বেলাশেষের মূলতানে বেজে উঠেছে, তখন তার মধ্যে বীণকারের দরদটি দেখতে পাই।

বঙ্কিম-সাহিত্যে অসংযমের প্রতি করুণা আছে, অসংযমের সমর্থন নেই অথবা অসংযম থেকে কোন সঙ্গীতের প্রেরণাও নেই। অন্তরের করুণায় ও শিল্পের প্রয়োজনে অসংযমকে যে রঙীনতায় উপস্থিত করেছেন, তাতে বঙ্কিমের কোন সমর্থন কল্পনা ক'রে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না।

নারীর অসংযত ক্ষুধার সমর্থনে একদিকে যেমন অনেকেই বঙ্কিমকে রক্ষণশীল বলে গাল পেড়েছেন,—বলেছেন, মনের স্বাভাবিক সৃষ্টিধর্মিতার স্বীকৃতি নেই বঙ্কিম-মানসে; তেমনি পুরুষের অসঙ্গত ভোগের সমর্থনে কেউ আবার বঙ্কিম-সাহিত্যে পৌরুষ-অপৌরুষের ভেদটি বিস্মৃত হয়ে বঙ্কিমের উপর এক নূতন জীবন-বাদ আরোপ করেছেন,—বলেছেন, বীরাচারী তান্ত্রিকতায় নায়ক চরিত্রের মহিমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। বিরোধী ও সমর্থক—উভয়ের কাছ থেকেই বঙ্কিমকে শাস্তি পেতে হয়েছে; নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিকোণের জন্যেই বঙ্কিমের দৃষ্টিকোণ থেকে সরে গিয়েছেন তাঁরা।

কাম একাভিমুখী হলেই তার ভারসাম্য ঠিক থাকে। কামের বহুমুখিতাই অসংযম। তাকেই বঙ্কিম বলেছেন রূপমোহ। কামের একাভিমুখিতাই প্রেম। এক-কে আশ্রয় করলে কামবৃত্তির স্ফুরণে ঔচিত্যের সীমা নির্দেশ করা যায়, কাম-শান্তির অবকাশ থাকে। বহুতে লিপ্ত হলে ঔচিত্যবোধ লোপ পায়। তৃপ্তিহীন বহু-ভোগে তো নিবৃত্তির অবকাশ নেই। একের মধ্যে কামের যে আশ্রয়, তাতে উচিত স্ফূর্তির পর—বঙ্কিমের ভাষায়, 'সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী স্ফুর্তির পর',—কাম শান্ত হয়, ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়। তখনই কাম থেকে প্রেমের উদ্ভব।

কামের একাভিমুখিতা,—তার অর্থ এই নয় যে, এক-কে নিয়ে ভোগের অসংযম। তেমন দাম্পত্য-জীবনকে বঙ্কিম পাশবতা বলবেন। তবে একের প্রতি নিষ্ঠাতেই কাম প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে, মোহ থেকে মোহ-শান্তি আসতে পারে। সেই মোহ-শান্তির জন্যেই একনিষ্ঠার কথা, সতীত্বের কথা প্রেমের চরিত্র বলে প্রকাশ করলেন।

আর এই একের হিসাব যদি অদৃষ্টক্রমে ভুল হয়ে যায়? যদি সেই একজন জীবনে না আসে?

তবে নিরাশ্বাস জীবনে হাহাকার না করে, অথবা পরজন্মের আশায় না থেকে এ জন্মেই জীবন সার্থক করে তুলতে হবে। অমরনাথের ভাষায়—"যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব।"

ব্যক্তিকে আশ্রয় করে যখন জীবনে সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষা, তখন তা প্রেম; আর ব্যক্তির অতীত কোন পরিপূর্ণতার আদর্শকে ঘিরে যখন এই সামঞ্জস্যের প্রয়াস, তখন তা ভক্তি।

'ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য। যখন সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।'

ব্যক্তিতে যা প্রেম, ঈশ্বরে তাই ভক্তি। ব্যক্তির মধ্যে সীমা আছে, অপূর্ণতা আছে;—প্রেম তাই শেষ নয়, প্রেম তাই সোপান। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়, ব্যক্তি থেকে ঈশ্বরে, প্রেম থেকে ভক্তিতে জীবনের অভিযাত্রা।

জীবনের এই অভিযাত্রায় অমরনাথ মোহ থেকে প্রেমে,—লবঙ্গলতা থেকে রজনীতে, এবং প্রেম থেকে ভক্তিতে,—রজনী থেকে ঈশ্বরে আশ্রয় লাভ করেছে। এ আশ্রয় বাঞ্চিত জীবনের দুর্বল হতাশ্বাস নয়; বঙ্কিমের ধারণায় জীবনের এ এক পরম পরিণাম।

৪

প্রেম অর্থাৎ একনিষ্ঠা, নারীর মধ্যে যেমন সতীত্বে প্রতিভাত, পুরুষের মধ্যে তেমনি পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত। অসংযত লালসা নারীকে যেমন মহিমা এনে দেয় না, পুরুষকেও তেমনি পৌরুষে জাগ্রত করে না। লালসার বহ্ন্যুৎসব অপূর্ব দীপ্তিতে প্রকাশিত হলেও, অথবা নিষ্ঠুর নিয়তির মতই দুর্বল জীবনকে চালিত করলেও তার অর্থ এই নয় যে, সে পাপ 'মনুষ্যত্বের অবিচ্ছেদ্য মূল'। স্রোতের বেগে জীর্ণ নৌকা ভেসে গেল বলে এ কথা বলব না যে, নৌকা মাত্রেরই এইরকম ভেসে যাওয়াই ধর্ম। দুর্বার স্রোতটা হয়তো সত্য, কিন্তু সেই স্রোত উত্তীর্ণ হয়ে তীরে এসে পৌছাবে, এমন নৌকাও কি নেই, অথবা বঙ্কিম তার রসিক নন ?

জীবন-তরণীগুলো ভেসে গেল দেখে, সেই ভেসে যাওয়ার সমর্থনে বঙ্কিম প্রতিভার ওপর স্বকীয় কবি-দৃষ্টির এক নূতন আলোকপাত করেছিলেন স্বর্গত কবি সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। তিনি বলেন—"বঙ্কিম দেহদশাধীন পুরুষের সেই নির্মম নিয়তিকে কোথাও অবজ্ঞা বা অস্বীকার করেন নাই, বরং তাহার সেই রক্তরশ্মির জ্বলন্ত প্রভায় পুরুষ চরিত্রগুলি আদ্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। ………পাপকেই তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়াছেন, তাহার কারণ, তাহাই যে মানুষের মনুষ্যত্বের অবিচ্ছেদ্য মূল! প্রকৃত তান্ত্রিকের মত তাহাকে সর্বস্ব নিবেদন করিয়া তাহার হস্ত হইতেই মুক্তির বরাভয় প্রথনা করিয়াছেন"।

এই কবি-দৃষ্টিতে মোহের মধ্যেও পৌরুষের প্রতিষ্ঠা, অসংযমেও গৌরবানুভূতি। সে ক্ষেত্রে আশ্রিতা বালবিধবার প্রতি নগেন্দ্রনাথের মোহের তাই বিশেষ ব্যাখ্যা— "এ রূপের আকর্ষণ, কিন্তু দেহের আকর্ষণ নয়। এ যেন অতি সূক্ষ্ম অশরীরী এক লাবণ্য—এক নূতন পিপাসা উদ্রেক করিয়াছে"।

এই 'নূতন পিপাসা'র খবর কিন্তু বঙ্কিম রাখেন নি। শ্রীমোহিতলাল এর স্বরূপ ব্যাখ্যানে বলেছেন: "বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের নিয়তিকে যে দিক দিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বীরাচারী তান্ত্রিকের পন্থা, তাহাতে অশক্তির বিশ্বপ্রেম নাই।"

বিশ্বপ্রেমে অশক্তি প্রকাশ পায় কিনা জানি না, কিন্তু বীরাচারী তান্ত্রিকতায় নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্রের যে পৌরুষ প্রকাশ পায় নি, তা বঙ্কিম দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমের ধারণায় রূপকে সম্মানের সঙ্গে যে বরণ করতে পারে, বীরের মত যে ভোগ করতে পারে, সে-ই যথার্থ পৌরুষের পরিচয় দেয়। ভোগের পাশবিকতায় সে পৌরুষ নষ্ট হয়। প্রেম ও রূপমোহে পৌরুষ ও অপৌরুষের ভেদটা খুব স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন বঙ্কিম। দেবেন্দ্রনাথকে তাই বৈষ্ণবী সাজিয়েছেন, নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালকে দুর্বল করেই এঁকেছেন। নগেন্দ্রনাথের রূপ-প্রশংসা শিক্ষিত, মার্জিত, রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তির লালসার একটা আবরণ মাত্র। ভোগের পর এর আর দেখা মিলবে না।

বঙ্কিম সাহিত্যে রূপমোহে পৌরুষ-অপৌরুষের এই ভেদ-রেখাটি অনেকে লক্ষ্য করেন না। নারীর প্রভাব লক্ষ্য করে যাঁরা সকল চরিত্রকে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেন, তাঁরা চিনি-মিছরীর একদর করে ফেলেন। তাঁদের কাছে, 'প্রেমিক বা ইন্দ্রিয়পরবশ যেমনি হউক, কোন নায়ক চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।'

বঙ্কিম কিন্তু পুরুষের পৌরুষকে এই তথাকথিত তান্ত্রিক ভোগবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করেন নি। ধর্মাধর্ম ভুলে পরস্ত্রীকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য কামনা করাতে কামনার খুব একটা ছটা ফুটেছে বটে, কিন্তু তাকে পৌরুষ বলে কোন ইজ্‌ম্‌ দিয়েই বঙ্কিম সমর্থন করেন নি। মহম্মদ তকি, ভবানন্দ, গঙ্গারাম — সকলেই একই অপরাধে অপরাধী। বীরাচারী তান্ত্রিকতা দিয়ে সে অপরাধ সমর্থন পেতে চাইলেও জীবনের মহত্তর ধর্মের কাছে—দলনী-কল্যাণী-রমার সতীত্বের কাছে সে সমর্থন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সে কথা বঙ্কিমের ধ্যানে ছিল, তাই সতীত্বের কাছে মোহকে, অপৌরুষকে কিছুতেই জয়ী করেন নি। তাই -

—দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন—'যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন'।

এর সামনে বীরাচারী তান্ত্রিকতার স্বরূপটি এইরকম—

"—মহম্মদ তকী দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা—সবেমাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত-বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি সে দুঃখে কাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? শয়তান আসিয়া তকির কানে কানে বলিল—'হৃদয়মধ্যে'।"

মোহ-দুর্বল পুরুষের মধ্যে শয়তানের এই মন্ত্রণা বঙ্কিম নানাভাবে দেখিয়েছেন। কোনখানে তাকে পৌরুষ বলে মূল্য দেন নি। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এর সমর্থন খুঁজতে গিয়ে শ্রীমোহিতলাল বঙ্কিম প্রতিভা এবং বঙ্কিমযুগকে তান্ত্রিকতার ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছেন। এ যেন আকাশটাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে সূর্যের পশ্চিমোদয় প্রমাণ করা। কিন্তু বঙ্কিম-মানস-গতির সম্যক পরিচয় এতে নেই বলে এ তত্ত্ব যতই জ্ঞানগর্ভ হোক, বঙ্কিমের খাতিরে তা বর্জন করতে হবে। বঙ্কিম-সাহিত্যে মোহ-জীবনের চিত্রগুলি শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে বলে তা থেকে বঙ্কিমের তান্ত্রিকতার সমর্থন মেলে না। বলা চলে না—

"দেহই সকল সাধনার সাধন-বেদী, বস্তুজ্ঞানই যে ব্রহ্মজ্ঞানের আদি সোপান —জাতির সেই প্রবুদ্ধ চেতনার পূর্ণ প্রস্ফুরণ হইল বঙ্কিম প্রতিভায়।"

—[বাংলার নবযুগ]

"য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ ও ভারতীয় ব্রহ্মবাদ, এই দুইয়ের মধ্যপন্থার সন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তন্ত্রপন্থী হইতেই হইবে।" —[বাংলার নবযুগ]

আমরা জানি, বঙ্কিম তন্ত্রসাধক বা তান্ত্রিক ছিলেন না। তান্ত্রিক ছিলেন না, অথচ তাঁর মধ্যে তান্ত্রিকতা ছিল, এ কথার তাৎপর্য কি? এতে তন্ত্রধর্ম থেকে একটা ইজম্ ছেঁকে নিয়ে বঙ্কিমের ওপর তা আরোপ করা হয় না কি? এবং এই তান্ত্রিকতার তাৎপর্য কি এই যে, —"বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বেও দেহই আদি ও প্রধান সাধন, জগৎ মিথ্যা নয়, সত্য; এখানেও দেহের ও মনের বৃত্তিগুলির পূর্ণ উন্মেষের দ্বারা [উন্মেষ ও অনুশীলনের মধ্যে বঙ্কিম কোন পার্থক্য দেখেন নি কি?] ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হয়। [বাংলার নবযুগ—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার]

এবং এই তান্ত্রিকতায়—

শিব-শক্তি বা পরাশিবের তত্ত্ব, কুণ্ডলিনী শক্তি ও সেই শক্তির জাগরণ ও লয়-যোগ প্রভৃতির তত্ত্ব নাই বটে—কারণ ইহার ভাব ও ভাষা উভয়ই কিছু ভিন্ন —তথাপি মূলে একটা সাদৃশ্য আছে। এখানে সেই তন্ত্রধর্মের আধ্যাত্মিক গুহ্য সাধনাকে বাহিরের দিকে ফিরাইয়া তাহাকে সার্বজনীন মনুষ্যত্বের উপযোগী করা হইয়াছে, তন্ত্রের সেই কায়ারূপিনী মহামায়া এখানে অপরিণত মনুষ্যত্বের স্বার্থ-কলুষিত জগৎ-চেতনা, এবং সর্ব্বমানবময়ী মহাদেবীই (humanity) সেই ব্রহ্মময়ী সত্যস্বরূপিনী মহামায়া।" —[বাংলার নবযুগ]

তন্ত্রধর্ম থেকে তান্ত্রিকতা নামে এক পৃথক মতবাদ বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া চলে

না। যদি কেউ করেন, তবে সেটা তন্ত্রসম্মত নয়, সে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। সে দৃষ্টির মূলে তন্ত্রের সমর্থন নেই, এবং নেই বলে, গালভরা নামে তার কোন গৌরববুদ্ধিও নেই। তা এক পৃথক জীবনবাদ—ভোগগত, প্রবৃত্তিগত দেহাত্মবাদ। পুরুষের দেহভোগের সমর্থন খুঁজতে গিয়ে বঙ্কিম-চেতনায় এই এক বিশেষ মতবাদ 'বীরাচারী তান্ত্রিকতা' নাম দিয়ে শ্রীমোহিতলাল আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু তন্ত্রের কথাটা কি আমরা যদি বুঝে দেখি তবে এ রকম কোন তান্ত্রিকতার অস্তিত্ব অস্বীকার্য হয়ে পড়ে।

'তন্ত্যতে জ্ঞানম্ অনেন—ইতি তন্ত্রম্।' এই জ্ঞান কি রকম?—

"It is the actual experience of this declaratian of 'So ham' which in its fundamental aspect is Veda—knowledge (Vid) or actual Spiritual Experience. For in the monistic sense, to truly know any thing is to be that thing. This Veda or Experience is not to be had sitting down thinking vaguly on the Great Ether and doing nothing. Man must transform himself, that is act in order to know. Therefore the watch word of the tantras is kriya or action ["Shakti and Shakta"—J. woodroffe]

এই ক্রিয়া বা আচার কিরূপ?—

The Acharas set forth the means by which 'So ham' is to be translated into actual fact for the particular Sadhak.

কাজেই তন্ত্র থেকে পৃথক আচারবিহীন তান্ত্রিকতা বলে কোন পদার্থের অস্তিত্ব নেই। শ্রীমোহিতলালের ব্যাখ্যাত 'তান্ত্রিকতা' তাই ভোগবাদের সমর্থনে তন্ত্রতত্ত্বের একটি বুদ্ধিগত ছলনা মাত্র। একে Pseudo Tantricism বলতে পারি। আমাদের মনে হয়, মোহ্ ত্যাগ করে 'তান্ত্রিকতা' শব্দটি এখানে বর্জন করাই ভাল। শ্রীমোহিতলালের কবি দৃষ্টির স্বকীয়তা হিসাবে তার পৃথক গৌরব থাকতে পারে কিন্তু বঙ্কিমের মানব প্রেমকে যখন এই তথাকথিত তান্ত্রিকতার ফ্রেমে বাঁধিয়ে মহামূল্য বলে ঘোষণা করা হয়, তখন আমাদের কেমন যেন খট্‌কা লাগে। মনে হয়, এ যেন চাঁদের জ্যোৎস্নাকে রাঙতায় মুড়ে মূল্যবান করার চেষ্টা।

ভোগের অসংযম 'তান্ত্রিকতা' নামে কোন এক বিশেষ জীবনবাদে সমর্থন লাভ করবে, এমন ধারণা অনুশীলনবাদী বঙ্কিমের ছিল না। চিত্তবৃত্তির অসংযমে বঙ্কিম

কোন পৌরুষ দেখেন নি ; 'বীরাচারী তান্ত্রিকতা'র উপাধিতেও সেখানে পৌরুষ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

প্রেম, অর্থাৎ একনিষ্ঠাই পৌরুষের উপাদান—মোহ নয়, বহুগামিতা নয়, রূপের মোহ একের নিষ্ঠায় সংযত হয়ে প্রেমেরই চরিত্র লাভ করে। যদিও প্রেম সম্পূর্ণ এক পৃথক বৃত্তি, তবুও প্রেমের বাইরের ধর্মগুলি এই মোহ-সংযমের মধ্যেও প্রকাশ পায়। তাই প্রেমে যদি পৌরুষ, মোহ-সংযমেও তবে পৌরুষ। প্রেম ও মোহ-সংযমের মধ্যে যে প্রভেদ, এই দুই পৌরুষের মধ্যেও সেই প্রভেদ। দুই-ই মহৎ, কিন্তু দুয়ের জাত আলাদা। উভয়ের এই পার্থক্য না বুঝলে বঙ্কিমের জীবন-চেতনার গভীরতা আমরা সবটা অনুসরণ করতে পারব না।

মোহের বেদনাকে সংযমের বীর্যে জীবনের সাধনায় ফলবান করেছেন বীর প্রেমিক প্রতাপ রায়। কৈশোর প্রেমের অভিশাপ নিয়ে তাঁর জীবন-সাধনা সুরু। কিশোর প্রেমের এক বিশেষ চরিত্র আছে ; সে চরিত্র বুঝলে প্রতাপের ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি আমাদের কাছে ধরা পড়বে।

কিশোরের প্রেম যৌবনের ভোগবাসনা নয়, তা রূপানুভূতির প্রথম উল্লাস। এ উল্লাসে নবীন প্রাণের অমিত বীর্যে বিশ্বজয়ের অভিযাত্রা। এ প্রেমে তাই যৌবনোন্মেষের প্রত্যুষে রূপানুভূতির রোমাঞ্চকর দ্যুতি ;—আপনার মধ্যে নবীনের, সবুজের, প্রাণ-প্রাচুর্যের উদ্বোধন। ভোগের অধিকার হয়নি, তাই পুষ্পধনুর পঞ্চশরে এ প্রদীপ্ত হয়েছে মাত্র, বিপর্যস্ত হয়নি। প্রাণের আবেগে চঞ্চল হয়েছে, ভোগের বাসনায় ব্যাকুল হয়নি। কামের রূপটি এখানে বড় সুকুমার—কৃষ্ণা-নিশীথের তরল জ্যোৎস্নার মত,—বর্ষণ-ক্লান্ত প্রভাতের শান্ত বাতাসের মত,—বেণুবনের ঘনচ্ছায়ায় দীপ্যমান জোনাকীর মত। কাম এখানে ভোগে মত্ত নয়, —ভোগের বিষয়কে ঘিরে সুন্দরের রঙ্গমঞ্চটি সজাবার আয়োজনে রত। সে আয়োজনে জীবনের উদ্বৃত্তের (surplus) প্রকাশ। যৌবনের প্রশস্ত রাজপথে এ হয়তো ভোগ্য বিষয়কে স্বাভাবিক ভাবেই একদা দাবী করবে কিন্তু এখন এই সুকুমার কাম তার প্রচুর প্রাণ নিয়ে হৃদয়ের অজ্ঞাত কুঞ্জবনের রহস্যময় ছায়াপথে নিজেকে শুধু প্রণয়ীর কাছে নিবেদন করে দিতে চায়। সংযম এর কাছে সাধন-সাপেক্ষ নয়, এর স্বভাবেই সংযম রয়েছে। ভোগের প্রতি স্বতঃ-ই এ উদা-

সান। প্রাণ প্রাচুর্যে নেবার দিকে নয়, দেবার দিকেই এর প্রবৃত্তি। কামেরই এ এক অপূর্ব চরিত্র। এ কাম তাই সুকুমার।

পঞ্চশরের খেলায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে যদি কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে তবে তা বোধ হয় এই সুরুতেই,—অর্থাৎ, কৈশোর প্রেমেই। নতুবা ভোগজীবনের মনস্তত্ব উভয়ের মধ্যেই সমান। কিন্তু কিশোর প্রেমের এই চরিত্র বোধ করি পুরুষেই সম্ভব।—"বালকের মত কেহই ভালবাসিতে পারে না"—বলছেন বঙ্কিম, প্রতাপের পরিচয় প্রসঙ্গে। আপনাকে ভোগ্য জেনে নারী বোধ করি ভোগকে এত ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে পারে না। পুরুষের মোহেই নারীর অহং পরিপুষ্ট হয়, প্রশ্রয় পায়; আত্ম সচেতন হয় নারী। ভালমন্দের বিচার বোধ আসে। কামের সৌকুমার্য নষ্ট হয়; ছলনার মায়াজাল বোনা হতে থাকে। কিশোর প্রেমের সৌকুমার্য তাই বোধ করি পুরুষেই সম্ভব। কিশোরী নারী যদি প্রেমিকা, তবে সে আর বালিকা নয়,—নারী; ছলনাময়ী—বিচিত্ররূপিনী—রহস্যময়ী নারী।

কৈশোর প্রেমে নারী-পুরুষে যে ভেদ, শৈবলিনী-প্রতাপেও সেই ভেদ। এই ভেদ-ই কি কৈশোর প্রেমের অভিশাপ, যে-অভিশাপে দুজনে কিছুতেই মিলতে পারে না? জীবনের মধ্যে যে মিলন হয় না, সে তো বাইরের শত সহস্র কারণে। সে বাধা তো অভিশপ্ত নয়। কিন্তু বাইরের বাধা উপেক্ষা করে মৃত্যুর মধ্যেও যেখানে মিল হয় না, অভিশাপ তো সেইখানেই। উভয়ের চরিত্র পৃথক বলে, মিলন সেইজন্য হবে না বলেই কি অভিশাপ? যে অবস্থায় মিলন সম্ভব নয়, তাকে মিলনের অনুকূল বলে লালন করাতেই কি অভিশাপ?

মৃত্যুর বৈতরণী থেকে ফিরে এসে জীবনের ভিন্ন এক তটে দাঁড়িয়ে এ অভিশাপের কথা শৈবলিনী ভুলেছে। আর ভুলেছে বলেই কৈশোরের প্রণয় শৈবলিনীর যৌবনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে নিদারুণ রূপতৃষ্ণায় উর্ধ্বশিখা হয়ে জ্বলছে। তা অবৈধ জেনে, অসামাজিক জেনে যদি কোন অবদমনের চেষ্টা অন্তরে অন্তরে হয়ে থাকে, তবে তাতে কামের আগুন নেভেনি, শুধু শিখাটাই চাপা পড়েছে, আর তার আঁচে পারিপার্শ্বের সব কিছু ঝলসে গেছে। তাই চন্দ্রশেখরের মহিমার প্রতি শৈবলিনীর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য; তার সংসারের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা।—"দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম। যদি পিতৃমাতৃ-কুলে কাহারও সন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়ে থাকি।—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব।—নচেৎ জলে ডুবিয়া

মরিব।…………কিন্তু মরি বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না।"

ভোগ-জীবনের যে অতৃপ্তি এই কঠিন বিমুখতার মূল, তার জন্য কি চন্দ্রশেখরের অধ্যয়ন-অধ্যুষিত রাত্রির ঔদাসীন্যই দায়ী, শৈবলিনীর গোপন মোহ-জীবনের অন্ধতাও কি দায়ী নয়?—"তুমি কি জাননা, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল?"—এই প্রশ্নে সেই মোহ-বাসনা কি উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশ পায় নি?

চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্বকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার পক্ষে শৈবলিনীর মত বালিকা-বুদ্ধি নারী নিতান্তই অযোগ্যা। আবার হৃদয় দিয়ে অনুভব করার পক্ষে প্রতাপ-সংস্কার ও পূর্বস্মৃতির বেদনাবেগ একান্ত বাধা। মোহ-জীবনের অতৃপ্তি চন্দ্রশেখরের চরিত্র-জ্যোৎস্নাকে শৈবলিনীর কাছে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু নীরব উদাসীন ও সদানন্দ চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর অবচেতনায় ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে যে পদ-ক্ষেপ করেছেন তা প্রতাপ-প্রত্যাখ্যাত হয়ে শৈবলিনীর মনে বেদগ্রামের স্মৃতির পুনরুদ্দীপনায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। অবচেতনায় চন্দ্রশেখরের প্রভাবটি আছে বলেই প্রতাপের প্রত্যাখ্যানে মনের গতি ভিন্নমুখী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত মনস্তাত্ত্বিক অবকাশ পেয়েছে। চন্দ্রশেখরের নীরব ব্যক্তিত্বের সেই গভীর প্রভাবটি বঙ্কিম কৌশলে গোপন রেখেছেন, উদভ্রান্ত-চিত্ত শৈবলিনী কামনার প্রখর রৌদ্রদাহের মধ্যে প্রতাপের আকাশেই পাখা মেলেছে, চন্দ্রশেখরের শান্ত প্রদীপালোক-স্নিগ্ধ কুটিরকে আশ্রয় বলে মেনে নেয় নি বা মানিয়ে নেয় নি। সেই নীড়-ছাড়া ক্ষুধা অধর্ম জেনেও প্রতাপের স্মৃতিকে শুধু লালনই করেনি, তার জন্য সচেতন বিদ্রোহও অনুভব করেছে। পরিণীতা রমণী কটাক্ষজালে পূর্ব-প্রণয়ীকে মোহাবদ্ধ করার কুটিল চক্রান্তে চক্রধারিণী সর্পের মতই বিষোদ্গীরণে উদ্যত।

সেই বিষভরা ফণার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতাপ গাল দিয়েছে,—পাপিষ্ঠা!

এই তিরস্কারই প্রতাপের পৌরুষ। অসতীত্বের কালিমার পাশে পৌরুষের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। পৌরুষের সেই মহিমাটি আমরা বুঝে দেখি।

মৃত্যুর ঘূর্ণীতে শৈবলিনী থেকে প্রতাপ যেমন দূরে সরে গেলেন,—উপনীত হলেন জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে; তেমনি মৃত্যুর আশীর্বাদে কৈশোর তাঁর মধ্যে চিরন্তন হয়ে রইল। সংযম হল স্বভাবজ, প্রাণশক্তি হল দুর্বার।

সেই প্রাণসম্পদ নিয়ে চন্দ্রশেখরের সহায়তায় প্রতাপ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন, নবাব সরকারে পেলেন চাকুরী, আপন গুণে অর্জন করলেন যশ, প্রতিষ্ঠা। রূপসীর সঙ্গে ইতিপূর্বেই বিবাহ হয়েছিল, তাতে স্থির হল সামাজিক জীবন; ভারসাম্য রক্ষিত হল। জীবনে এ প্রতিষ্ঠা না পেলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু এখন অন্ততঃ এমন কোন অভাববোধ রইল না যা তাঁর মধ্যে অতৃপ্তির বিকার রচনা করতে পারে, কিশোর চেতনার শুচিতাকে নষ্ট করে কোন অবৈধ ভোগের স্বপ্নে জীবনকে কালো করে দিতে পারে;—পৌরুষের হানি ঘটাতে পারে।

কৈশোরের প্রণয় যদি জীবনকে কিশোর-স্বভাবে দীক্ষিত করে, তবে কামেরও সৌকুমার্য জীবনে সংযমের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে দেয়। পূর্ব-প্রণয়ীর প্রতি ভাল-বাসা অন্তরের নিভৃত অন্তঃপুরে নির্জ্জন মনের জগতে যে বেদনা-উৎস রচনা করে, তা ক্ষুধার দহনে জীবনের সৌধকে জীর্ণ করে না। স্বভাব সংযমে পরিশুদ্ধ (sub-limated) হয়ে জীবনে প্রাণশক্তির বিচিত্র স্ফুরণ ঘটায়।

তবু মর্মের মৌনে অতীত জীবনের স্মৃতি ভবিষ্যতের কোন স্বপ্ন-জাল রচনা করে না কি? ভোগ-বিরহিত কোন আনন্দধ্যানে মন মনেরও অগোচরে সমাহিত হয় কি?

মনের সে নিগূঢ় লীলা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু প্রতাপের ক্ষেত্রে তা যে হয় নি তা বুঝতে পারি চন্দ্রশেখরের কাছে প্রতাপের ঋণের পরিমাণ দেখে। শৈবলিনী যে চন্দ্রশেখরের মহিমা বুঝতে চায়নি, প্রতাপ সেই চন্দ্রশেখরের পদধুলি নিয়ে কৃতার্থ হয়েছে। শৈবলিনীর বিশ্বাস ছিল প্রতাপ-পক্ষীকে কটাক্ষ-জালে ফাঁদ পেতে ধরবে, প্রতাপের অতীত দুর্বলতার সাক্ষ্য আছে তার নিত্য রোমন্থন-করা স্মৃতিতে। কিন্তু প্রতাপের অন্তরে চন্দ্রশেখরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কোন ধারনাই ছিল না শৈবলিনীর।

বেদগ্রাম চন্দ্রশেখরের গ্রাম বলেই সে-পথের বিষধর সর্প সহজেই চোখে পড়েছে প্রতাপের। সচেতন হয়েছে প্রতাপ। গুরুতুল্য চন্দ্রশেখরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাতেই শৈবলিনীর অনুচিত কামনার প্রতি মর্মান্তিক ঘৃণা স্বতোৎসারিত হয়েছে!

প্রতাপ যদি চন্দ্রশেখরকে অযোগ্য বলে জানতেন, তবে সহানুভূতির ছদ্মবেশে কাম খেলা করত। শৈবলিনীর জন্যে কোন নিভৃত নীড় হয়তো মর্মের মৌনে গড়ে উঠত। শৈবলিনীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে জীবনের একটা চাহিদার সম্মুখীন হতেন এবং সে চাহিদায় প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে করতেন চন্দ্রশেখরকে।

কিন্তু চন্দ্রশেখরের চরিত্রমহিমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন ক্ষেত্রই রচিত হয় নি। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে শুধু জীবনই দেন নি, প্রতিষ্ঠাও দিয়েছেন। চন্দ্রশেখর থেকেই প্রতাপের সব, সেই চন্দ্রশেখরের পত্নী যখন শৈবলিনী, তখন সে গুরুপত্নীর মতই অগম্য।

মনোজীবনের এই চিত্রগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বঙ্কিম করেন নি, ভাস্কর্য-রীতি গ্রহণ করে আমাদের দেখার ওপরেই নির্ভর করেছেন। তাই মনোজীবনের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা না করে কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তার ইঙ্গিত দেওয়াই তাঁর শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। ঘটনাগুলি যেন জমাট বাঁধা ছবি। বিশ্লেষণ করলে অবিশ্বাস্য ভাবে বহু ছবি বার হয়ে আসে। বঙ্কিমের শিল্পরীতির এ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হলে আমরা সহজেই ঘটনার ব্যাখ্যায় অগ্রসর হতে পারি। নতুবা বাইরে থেকে দেখলে সাধারণ মোহের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে প্রতাপের প্রতি অবিচার করব আমরা। অথচ প্রতাপ কখনই নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলাল-ভবানন্দের সমজাতি নয়। তার পৌরুষের ধাত আলাদা। তবু বঙ্কিম প্রতাপকে একবার পরীক্ষা করে নিয়েছেন। মুঙ্গেরের গৃহে প্রতাপের শয্যায় শৈবলিনী যখন একাকী শায়িতা, তখনও প্রতাপ চরিত্রের অবিচলিত শুচিতাই প্রকাশ পেয়েছে।

অথচ সেই শৈবলিনী যখন জানাল, প্রতাপ তার সুখের অন্তরায়, তখন অভিমানে বিশ্ব বিস্মৃত হয়ে আত্মবিসর্জন দিলেন প্রতাপ রায়। রণক্ষেত্রে এ প্রাণবিসর্জন, আর গঙ্গাবক্ষে প্রাণবিসর্জন—পৃথক ঘটনা হলেও উভয়ের জাতি এক। কিশোর প্রেমের আত্মনিবেদন—প্রাণোৎসর্গের মধ্যে যার চরম পরিচয়।

যাকে ভালবাসি, তাকে মন্দ জেনে ঘৃণাও করি—কিন্তু অন্তরে তারই ভালবাসার অপেক্ষাও করি। সে ভালবাসুক, এ চাই না, কারণ তার ভালবাসা নিন্দনীয় বলে, সে ছোট হয়ে যায় বলে। তাই যত বাসনা প্রকাশ করে তত প্রতিঘাত করি। কিন্তু যে মুহূর্তে সে মুখ ফেরায়, তখনই অভিমান জেগে ওঠে, আমাকে তার প্রয়োজন নেই এ কথা জেনে জীবন শূন্য হয়।

এই শূন্যতায় প্রতাপ রূপসীকে ভুলেছে, নিজের সন্তান ভুলেছে, কিশোর প্রেমের আবেগ নিয়ে অভিমানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এ ও পৌরুষ—কিন্তু কিশোরের পৌরুষ। কামেরই এক সুকুমার খেলা। যদিও মৃত্যু এর পরিণাম, তবু এ-মৃত্যু দীন নয়,—ইন্দ্রিয়-জয়ের গৌরবে এ মৃত্যু মহৎ; সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর অশ্রুতে অভিনন্দিত।

প্রতাপের পৌরুষ যদি প্রাণশক্তির প্রকাশে, চন্দ্রশেখরের পৌরুষ তবে আত্ম-শক্তির বিকাশে। একটিতে ক্ষাত্রতেজ, অপরটিতে আর্ষ প্রতিভা। পৌরুষের এই দুই ধারা—দুই-ই শ্রদ্ধেয়। শৈবলিনীর জীবন-প্রবাহের দুই তটে পৌরুষের এই দুই বেলাভূমি গড়ে তুলেছেন বঙ্কিম।

শৈবলিনী স্রোতস্বিনী, কামনার জোয়ারে প্রতাপের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়েছে বলে, সেই দিকেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস বেশি বলে, গর্জনে প্লাবনে ও ফেনরাশিতে সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বঙ্কিমকেও সেদিকে অধিক ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ; তাই আর একদিকের বেলাভূমি আমাদের বিশেষ নজরে আসেনি।

কিন্তু এক সময় জোয়ার গিয়েছে নেমে, ভাটার টানে নদী হয়েছে সমুদ্রগামী। তখন যে তটভূমি দৃষ্টির অগোচর ছিল, তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এখানে উপন্যাসের শিল্পরীতিতেও (Technique) একটু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর—প্রতিনায়ক ও নায়ক—এই দুই চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপ-ন্যাসের ঘটনাবলী দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছে এবং দুই ভিন্ন লয়ে আবর্তিত হয়েছে। অথচ ঔপন্যাসিক বিশেষ নৈপুণ্যে এই দুই ভিন্ন লয়ের গতিকে একই গন্তব্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রতাপকে নিয়ে শৈবলিনীর মোহ-জীবনের যে প্রকাশ, তাতে দ্রুতলয়ের প্রবল সংঘাত-পূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতঃ অসংযত হৃদয়বৃত্তিতে ঘটনার প্রাবল্য যায় বেড়ে ; চিত্ত যখন শান্ত, সংযত—ঘটনাও তখন ধীর-গতি। অন্তরে বিক্ষোভ থাকলেও সংযমের ফলে বাইরে ঘটনাসংঘাত অল্প। শৈবলিনীর উদভ্রান্ত বাসনায় কাহিনী আপনার ঘূর্ণাবেগে বিচিত্র ঘটনাজালের মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়ে ইতিহাসের দ্রুত-লয়ের ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিষয়ের দিক থেকে মোহ-জীবনের কাহিনী বলে এবং ভঙ্গীর দিক থেকে ইতিহাসের ছন্দঃ-স্পন্দ প্রকাশ করায় শৈবলিনী-প্রতাপের কাহিনী আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সে কাহিনীর মাঝখানে নায়ক চন্দ্রশেখরকে কিছুটা নেপথ্য রেখেছেন বঙ্কিম।

সৌধোপরি পেচকের গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনিতে নিশাথের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে আমাদের সামনে ক্ষণিকের জন্যে এসে দাঁড়ালেন বাণীর একনিষ্ঠ সাধক চন্দ্রশেখর।

তাঁর দৃষ্টিপথে অনিন্দ্য সুন্দরী বিংশতিবর্ষীয়া পূর্ণযৌবনা রমণী প্রসুপ্তা। ভূতলের সেই খণ্ড-স্বর্গের দিকে চেয়ে চন্দ্রশেখরের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। জীবনের অসঙ্গতি অনুভব করলেন। বুঝলেন, জীবনকে বুঝি উপেক্ষা করেছেন, বুঝি অস্বীকার করেছেন যৌবনের চাহিদাকে। দুঃখিত চিন্তিত চন্দ্রশেখর রাত্রে অভুক্ত রইলেন।

ঘটনার দিক থেকে নিশীথের এই নীরব অশ্রু খুবই সামান্য। বোধ করি তেমনি সামান্য মশালের আলোয় দস্যুর লুণ্ঠনের কাছে, শৈবলিনীর গৃহত্যাগের কাছে, চন্দ্রশেখরের ভদ্রাসন ত্যাগ।—

"চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।······সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গন মধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশাকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

·········রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না —কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।"

একই সঙ্গে দুই পৃথক লয়ের ঘটনা দুই পৃথক শিল্প-রীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে লেখনী বৈচিত্র্য সন্ধানী ও দ্রুতগতি সম্পন্ন, অপরদিকে তেমনি আশ্চর্যভাবে শান্ত ও সংযত। একদিকে ইতিহাসের ঘটনা সংঘাত, অপর দিকে স্বপ্ন অবতারণায় মনোজীবনের গভীর রহস্যানুসন্ধান। একদিকে জীবনাবেগে বিপুল কর্ম চাঞ্চল্য, অপর দিকে প্রশান্ত চিত্তে আত্মানুসন্ধানের জন্য গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ। এক দিকে ভোগ-বাসনার কুটিল চক্রান্ত, আর এক দিকে প্রেমের উদার ক্ষমা। একদিকে রণক্ষেত্রের কোলাহলে মৃত্যু নৃত্যপর, অপরদিকে পল্লী-কুটিরের শান্ত প্রদীপটি নিশীথের পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে নীরবে দীপ্যমান।

একদিকে রঙ কিছু কড়া করে লাগানো, সুর কিছু চড়া করে বাঁধা। সে জন্য প্রথমদিকে করতালি দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ শূন্য করে যেন চলে না যাই। চন্দ্রশেখরের দীক্ষায়, শৈবলিনীর মর্মদাহে, যোগবলের প্রয়োগে যেন অধৈর্য হয়ে না পড়ি। যে জীবন-তরণী উধাও গতিতে পালের হাওয়ায় আঘাটায় আছড়ে পড়েছিল, এ সবের মধ্য দিয়ে তাকে হালের বশে এনে তীরে পৌঁছে দিয়েছেন বঙ্কিম—অন্যপূর্বা গৃহত্যাগিনী রমণীকে আশ্রয় দিয়েছেন।

সেই জন্যে অবিচলিত-চিত্ত পুরুষের দুই সবল বাহুকে নেপথ্যে রেখেছেন

বঙ্কিম। ভাটার টানে যখন জল গেল নেমে তখন নদীতলের বেলাভূমি—চন্দ্রশেখরের পৌরুষ ধীরে ধীরে ফুটে উঠল।

জীবন-যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করে শৈবলিনী রণে ভঙ্গ দিল। সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়ে ঝড়-বৃষ্টির মধ্য যখন বিপদসঙ্কুল পার্বত্য পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অক্ষম, সঙ্গীহীন, নিঃসহায় শৈবলিনী পথপ্রান্তে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল, তখন দুখানি সবল বাহু পরম যত্নে তাকে তুলে নিল। নিয়ে এল কঠিন প্রস্তর ভূমি থেকে জীবনের নিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে।

নৌকা এখন আর পালের হাওয়ায় চলে নি হালের নির্দেশে চলেছে। গতি তার মন্থর—এবং যে-পথে গতি, সে-পথও আমাদের মনোমত নয়। তাই শিল্পের মুন্সীয়ানাও এখানে স্বীকার করিনি, চরিত্রের পরিণামও ভাল লাগে নি। তাই এমন মন্তব্যও সম্ভব হয়েছে,—"চন্দ্রশেখর চরিত্রের সাত্ত্বিক কঠোরতা বঙ্কিমচন্দ্র মানবীয় হৃদয় বৃত্তির দ্বারা শোধন করিয়া যে আদর্শ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চন্দ্রশেখর শ্রদ্ধার অপেক্ষা কৃপার পাত্র হইয়াছেন। শৈবলিনী পাপিয়সী, অন্যপূর্বা ও কুলত্যাগিনী ; সেই পত্নীকে এরূপ শুদ্ধির দ্বারা পাপমুক্ত করিয়া সে যখন ঘরে তুলিয়া লইয়াছে, তখন তাহাতে তাহার অপার করুণা ও স্নেহ অপেক্ষা দুর্বলতাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

— ["বঙ্কিমবরণ"—শ্রীমোহিতলাল]

চন্দ্রশেখর চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষের সম্বন্ধে এই ধারণা বঙ্কিমের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী বলেই আমাদের মনে হয়। বঙ্কিমের জীবনচেতনায় পৌরুষের ধ্যান ও ধারণার সম্যক পরিচয় এতে পাওয়া যায় না।

বঙ্কিম চেতনায় পুরুষের আদর্শ কি রকম ছিল ? কোন্ পৌরুষ তাঁর প্রেরণা ? বঙ্কিম বলবেন—যিনি যুক্তাত্মা, তিনিই পুরুষ। যুক্তাত্মার লক্ষণ কি ?—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্ত স সুখী নরঃ॥ [গীতা—৫।২৩]

—যিনি জীবদেহে আমরণ কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ।

পুরুষোত্তমের চরিত্র যাঁর মধ্যে প্রতিফলিত, তিনিই পুরুষ নামের যোগ্য। যেমন সর্বব্যাপী আকাশ, অতি সূক্ষ্ম বলে, পঙ্ক প্রভৃতি পদার্থে বিদ্যমান থেকেও

কোন বস্তুতে লিপ্ত নয়; তেমনি পুরুষোত্তম পরমাত্মাও সকল দেহে বর্তমান থেকেও দৈহিক গুণ বা দোষে লিপ্ত নন [গীতা—১৩।৩৩]।

তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-জয়ের দ্বারা চিত্ত যাদের সংস্কৃত নয়, সেই চেতন বিহীন ব্যক্তিদের কাছে এই পুরুষ উপলব্ধির বাইরে। [গীতা—১৫।১১]

তাই চাঞ্চল্যে এবং অসংযমে যে পরিমাণে আমরা পরমপুরুষ থেকে বিযুক্ত, সে পরিমাণে আমরা পুরুষ নই—প্রকৃতি-লাঞ্ছিত প্রকৃতিরই বিকার। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-ধর্মই আমাদের মধ্যে যখন প্রধান,—পুরুষ-স্বভাব সেই পরিমাণে আচ্ছন্ন। পৌরুষ সেই পরিমাণে ব্যাহত।

বঙ্কিম কি তবে প্রকৃতিকে অস্বীকার করার কথা বলেন?

গীতায় প্রকৃতি-তত্ত্ব ব্রহ্মপরতন্ত্র। আনন্দগিরির মতে, শ্রীভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই তাঁহার যোনি, সর্বভূতের কারণ।

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্

সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ —(গীতা-১৪।৩)

প্রকৃতি সর্বকার্যের কারণ বলে মহৎ, এবং ব্রহ্মের উপাধি বলে, ব্রহ্ম। মহৎ ব্রহ্ম ঐশ্বরী চিচ্ছক্তি বা সাংখ্যীয় প্রকৃতি নয়। সাংখ্য প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন। তবে এই প্রকৃতি প্রতীয়মান জগৎ নয়, তা কোন অনির্দেশ্য বস্তু, যা আত্মার বা পুরুষের সন্নিধানে এসে আত্মার সৃষ্টি ক্ষমতা বলে পরিদৃশ্যমান জগতে পরিণত হয়।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে পার্বত্যভূমিতে বারিবর্ষণের অবকাশে বঙ্কিম যে সর্বার্থ-সাধিকা নানারঙ্গরূপিনী জড় প্রকৃতির বন্দনা করেছেন, সে বোধকরি সাংখ্যীয় প্রকৃতি। বলছেন:

"তুমি জড় প্রকৃতি! তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রিয়া কর, তাহা জানিনা—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম"

সাংখ্যীয় বা বৈদান্তিক, যেমনই হোক না কেন, প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হওয়া পৌরুষ নয়, প্রকৃতিকে জয় করাই পৌরুষ। এই জয়ের অর্থ বঙ্কিমচেতনায় কোন তান্ত্রিক ভোগ-বাদের সমর্থন নয় অথবা সংসার বিরাগী সন্ন্যাসিতাও নয়। গীতার এই পৌরুষ নিষ্কাম কর্মবাদের ভূমিকায় ভক্তিতত্ত্বে যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, বঙ্কিম তাকেই অনুসরণ করেছেন। প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত না হয়ে প্রকৃতিকে

জীবনে যে যথাযথ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে, সেই পুরুষ। সে পুরুষ যুক্তাত্মা ; সে ভক্ত।

"মাঞ্চ যেঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ [গীতা—১৪।২৬]

—যে নিষ্কাম কর্মী ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে সর্বভূতস্থ পুরুষোত্তমের উপাসনা করেন, তিনিই ত্রিগুণাতীত হয়ে (প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠে) ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হন।

বঙ্কিম জীবনকে স্বীকার করেছেন ; সমাজ-মঙ্গলের আদর্শে জীবনকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন বলে শাঙ্কর-দর্শনের মায়াবাদ অনুসরণ করে পরাতত্ত্বে উপনীত হন নি, বস্তু জগতে একটা নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ গোচর সত্যকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। অথচ সে-মঙ্গলাদর্শ যে বৃহৎ-চৈতন্যকে নিয়ে, তাতে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠার, তথা কাম-ক্রোধের দমন ও অন্যান্য চিত্তবৃত্তির অনুশীলনের কথা আছে। সেই বৃহৎ-চৈতন্য গীতা-ব্যাখ্যাত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। সেই পুরুষ বিশ্ব-সমাজকে ধারণ করে তার মধ্যে বাস্তব সত্যরূপে যেমন আছেন, তাকে অতিক্রম করে তেমনি অপ্রাকৃত-তত্ত্বরূপেও আছেন। সমাজ-মঙ্গলাদর্শের ভূমিকায় বঙ্কিম প্রাকৃত সত্য-টুকুর ওপরেই জোর দিয়েছেন, অপ্রাকৃত তত্ত্বটুকু তাঁর ধ্যানের নিভৃতে রয়েছে। সেই ত্রিগুণাতীত পরমতত্ত্বের কথা বঙ্কিম বুঝেও যেন স্বীকার করেন নি, কিংবা তাঁর মধ্যে অপ্রাকৃত তত্ত্বে আর প্রাকৃত সত্যে একটি গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। তাই শঙ্করের-মত অনুসরণ করে মুক্তিতত্ত্বে না গিয়ে প্রকৃতিকে বাস্তব বলে স্বীকার করে ভক্তিতত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। তাতে একই সঙ্গে জীবন ও জীবনাতীতকে স্বীকার করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠার কথা বঙ্কিম তাই ততটুকু বলেন, যতটুকুতে বিশ্ব-সমাজ গত পরম সত্যের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারি। বঙ্কিম তাই মুক্তির কথা না বলে ভক্তির কথা বলেন, অথবা গীতা-ব্যাখ্যাত ভক্তির এমনই এক সমাজ-জীবনগত মঙ্গলাদর্শের মূর্তি ব্যঞ্জিত করেন।

সেই মঙ্গলাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ভক্তিই পুরুষের চরিত্র। ভক্তিই পৌরুষ।

ঈশ্বরকে তথা পরিপূর্ণতার আদর্শকে ঘিরে এ চরিত্র নর-নারী নির্বিশেষে প্রকাশ্য। নর-নারীর তখন একটিই পরিচয়—ভক্তের পরিচয়।

ঈশ্বরকে ধ্যান করে যা ভক্তি, ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাই প্রেম। এই প্রেমই নারীর মধ্যে সতীত্ব, পুরুষের মধ্যে পৌরুষ। প্রেম তাই সমাজ-চেতনা-সাপেক্ষ বৃহত্তর মঙ্গলাদর্শ—নিছক ব্যক্তিগত ক্ষুধা পরিতৃপ্তি নয়। প্রেম কথাটির

মধ্যে তাই শ্রেয়ো সাধনার ধ্বনি আছে। ভক্তির আলোয়, সামঞ্জস্যের ভূমিকায় না দেখলে মোহ-প্রেমের বীরাচারিতাকেই [এমন কি পশ্বাচারিতাকেও] পৌরুষের চরম প্রকাশ বলে মনে হয়, শ্রেয়োসাধনার এই ধ্বনিটি অন্তর্ধান করে। প্রকৃতি-জয়ের পৌরুষও তখন অবজ্ঞাত থাকে।

অন্তরে দিব্য প্রেম নিয়ে বাত্যাবলুণ্ঠিতা শৈবলিনীর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন পৌরুষের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি—চন্দ্রশেখর। বললেন :

"—তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়াছিল,"

শৈবলিনী—"সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।"

—চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন ; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোম্মুখ হইয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্যন্ত।"

এই কথা কয়টির মধ্যে কি বেদনা! জীবনের দীর্ঘ সাধনায় কী নিদারুণ পরীক্ষা! আপনার সহধর্মিনী স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তিবশে গৃহত্যাগ করেছে, এ কথা জেনেও যে আত্মস্থ থাকতে পারে, সে কি এই চরিত্র—

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ
সর্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

কৃষ্ণার্পিতমনোবুদ্ধি সেই পুরুষ শৈবলিনীকে অপ্রকৃতিস্থা জেনে, বালিকার মত অসহায় জ্ঞানে সকল প্রায়শ্চিত্ত বিধান মুলতুবী রেখে, গুরুর কাছে অঙ্কে ধারণ করে নিয়ে এলেন। তারপর গুরুর আদেশক্রমে সেই উন্মাদিনীকে নিয়ে পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটিরে বহুদিন পর ব্রহ্মচারী বেশে প্রবেশ করলেন।

মনের গতি কেউ-ই রোধ করতে পারে না। মন ভুলও করে, সেই জন্যে সে ভুল সংশোধনের ক্ষমাও আছে। যদি একাধিক ভোগ না হয় [কারণ সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজে সন্তানের সুস্থ সামাজিক পরিচয়ের প্রশ্ন ওঠে], তবে বিপথগামী মন ক্ষমার পথ বেয়ে আবার ফিরে আসবে, তাকে নিয়ে ভাঙাঘর আবার গড়ে তোলা যাবে—এই Social Sanction—সামাজিক অধিকার, বঙ্কিম আমাদের এনে দিলেন।

কিন্তু এ জন্যে উদার-হৃদয় পৌরুষের প্রয়োজন। চন্দ্রশেখর সেই পৌরুষের প্রতিমূর্তি। আপনার ধর্মে অটল থেকে পরম স্থৈর্যে, প্রশান্ত গাম্ভীর্যে জীবনের ছিন্নমূল লতাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলা—'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস সেই পৌরুষেরই প্রেম-কাহিনী। সেই পৌরুষই তো বলতে পারে—

"ফষ্টর বধে কাজ কি ভাই—যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্তা? যে অধম. সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

—"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

—চন্দ্রশেখর সেই পৌরুষেরই উজ্জ্বল প্রেমচ্ছবি।

৬

মোহ বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন মূর্তি লাভ করে। তার রঙ বদল হয়। অসংযমে তা বহুগামিতা, সংযমে তা একনিষ্ঠ; কিশোর চরিত্রে তা প্রাণোদ্দীপনা, প্রজ্ঞাবানের মধ্যে তা শ্রেয়ো-চেতনায় ভাবগম্ভীর। রঙ বদলে ব্যক্তিত্বেরও ভেদ ঘটে। তাই মূলে মোহের সন্ধান পেয়ে সব চরিত্রকে একাসনে বসিয়ে দেওয়া অসঙ্গত শুধু নয়, মনস্তত্ত্ব বিরোধী। ব্যক্তিত্বের প্রকাশও যেমন ভিন্ন, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে মোহের সংজ্ঞাও পৃথক।

চন্দ্রশেখরের পৌরুষের যে পরিচয় আমরা নিয়েছি, তাতে তাঁর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষা-সংস্কারে মোহের জাত গিয়েছে বদলে। মোহ এই পৌরুষকে লাঞ্ছিত করেনি, অথচ জীবনের প্রেমে প্রচণ্ড আবেগে উদ্বেজিত করেছে। যে ঘর ছেড়ে গেছে অন্যের প্রতি আসক্ত যে নারী, মর্মের মৌনে কোথায় মোহজাত ক্ষমা নীড় বেঁধেছে যে, তাকেই দুহাতে তুলে নিয়ে পোড়ো ভিটেয় এসে জীবন গড়ে তোলার আয়োজন। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত সে তো সমাজকে চোখ-ঠারার জন্যে, নইলে চন্দ্রশেখর তাঁর প্রেম বেদনায় শৈবলিনীকে গ্রহণ করেছেন, সমাজের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত মুলতুবী রয়েছে।

সমাজ-মঙ্গলে নিয়োজিত বলে এবং আর্ষ প্রতিভার মধ্যে দিয়ে দীপ্তিমান বলে এ মোহকে আমরা প্রেমই বলব যদিও জানি বঙ্কিম-চেতনায় প্রেমের আরও গভীরতর ধ্যান আছে।

যে প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, যা গুণজ—যে-গুণ নিত্য নূতন ক্রিয়ায় নিত্য নূতন হয়ে প্রকাশ পায়—তার কথা এই মোহ প্রেমের মধ্যে নেই। মোহ থেকে তা স্বতন্ত্রবৃত্তি। সংযমের মধ্য দিয়ে মোহ একনিষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এই গুণজ প্রেমের স্বভাব লাভ করতে পারে কি?

রূপমোহের লীলা একরকম, গুণমোহের লীলা আর একরকম। রূপমোহ স্বভাবজ, গুণমোহ সংসর্গজ। একটিতে ভোগবাসনার উদ্বেলতায় দেহসৌন্দর্যের পূজা, আর একটিতে মহত্ত্বের উপলব্ধিতে চরিত্রমাধুর্য ধ্যান।

দাম্পত্যজীবনে সুস্থ ভোগের অবকাশে গুণের মোহ জাগবে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি পরস্পরে বৃহত্তর জীবনধর্মে, চরিত্র-মহিমায় আকৃষ্ট হবে, হিন্দুসমাজের এই আদর্শ বঙ্কিম অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। দাম্পত্যজীবনে যেখানে এই চরিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করার কথা নেই, সেখানেই দাম্পত্যজীবনের শুচিতা, মাধুর্য ও সৌন্দর্য অন্তর্হিত। সেখানে দাম্পত্যজীবন দেহ-ভোগের অবকাশ মাত্র, এবং তারপর নিষ্প্রাণ গতানুগতিক জীবনধারণ মাত্র।

দাম্পত্যজীবনকে যারা শুধুমাত্র যৌন-চর্যার দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে চান, যাঁরা বলতে চান দেহগত চাহিদাই তার সব কিছু, তাঁরা অংশকে সমগ্রের মূল্য দিয়ে বসেন। সে ক্ষেত্রে দাম্পত্যজীবনের ব্যাত্যয়কে যৌন মনস্তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেন এবং ক্ষুধার তৃপ্তিকে ক্ষুধার খাদ্য দিয়েই দূর করতে চান। এতে রূপমোহের কোন সমাধান মেলে না, তা প্রশ্রয় পেয়েই চলে। কিন্তু যৌনচর্যা জীবনের একটা আংশিক দিকমাত্র, তা সমগ্র জীবন নয়। সে অংশটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সমগ্রের মূল্য পেতে পারে না। অংশ যখন সমগ্রের স্থান দখল করতে চায়, তখন তা বিকার। জীবনে কাম যদি একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠে তবে তা সুস্থ জীবনের লক্ষণ নয়। যন্ত্রের একটা স্ক্রু তার মূল্যবান অংশ হতে পারে এবং তা শিথিল হলে যন্ত্র অচলও হতে পারে কিন্তু তাই বলে স্ক্রুটা যেমন যন্ত্রের সব নয়, তেমনি কামও জীবনযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে, তা জীবনের একমাত্র উপাদান নয়।

জীবনে তাই গুণ-মোহেরও অবকাশ আছে। এই গুণের মোহ শারীরিক হয়েও মানসিক। অনেকক্ষেত্রে ক্ষুধার মধ্যে এর অভ্যুদয় হতে পারে কিন্তু চরিত্রের মহত্ত্ব-বোধে এর পরিণতি। গুণ বুঝতে গেলে গুণের দরকার, মোহ-দুর্বল যে, সে গুণগ্রাহী হয়েও হতে পারে না। দেহ প্রধান হয়ে উঠে গুণকে আড়াল করে।

গুণ চরিত্রগত। চরিত্রের নিত্য নবায়মানতা আছে। সেই নিত্যনবায়মান

গুণের রসিক হতে গেলে নিজেকেও যে নিত্য নূতন হতে হয়। যে বৃত্তিতে নিত্যনূতনের অনুভবে নিজের মধ্যেও নিত্যনূতন হয়ে উঠি, তারই নাম তো প্রেম।

গুণের মধ্যে এই নিত্যনবায়মানতা হল আত্মারই বিকাশ। এই আত্মার ধর্মে মানুষ মহামানব—পূর্ণতার দিকে তার অভিযাত্রা। পূর্ণের সঙ্গে মানব তখন যুক্ত, অনন্তের সে তখন এক অংশ।

পূর্ণতার এই উপলব্ধি, অনন্তের এই চেতনা—একেই বলি প্রেম। রূপ-মোহে ব্যক্তির মধ্যে দেহ-সৌন্দর্যকে দেখি, প্রেমে দেখি আত্মার সৌন্দর্যকে, অনন্তের প্রকাশকে। ব্যক্তির অতীতে ঈশ্বরকে দেখাই হল ভক্তি; ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করাই হল প্রেম। এই প্রেমানুভূতিতে নিজেও যে নিত্যনূতন হয়ে উঠি, নিজের মধ্যেও যে অনন্তের আসন রচিত হয়। অনন্তের সঙ্গে নিজেও যে যুক্ত হই। প্রেম তাই আত্মোপলব্ধি।

ব্যক্তিকে নিয়ে প্রেমের এই ধ্যানটি বঙ্কিম-সাহিত্যে নানা বর্ণে চিত্রিত হয় নি, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিম এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, 'সীতারামে' শ্রীর প্রসঙ্গে একবার মাত্র এই প্রেমানুভূতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন চরিত্রে এই প্রেমের আনন্দলীলা স্থায়ীভাবে মূর্ত হয় নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, বিষয়টি অতিমাত্রায় Subjective বলে তা কাব্যেরই বিষয়, উপন্যাসের চরিত্রে তা রূপ দেওয়া বিশেষ সম্ভব নয়। কিংবা প্রেমের এমন একটা ধ্যান তখন এতই অপরিচিত, জীবনের এমন একটি ভাবুকতা এতই নূতন যে, সংস্কারের অভাবে তা যথাযথ তাৎপর্যে আমরা হয়তো গ্রহণ করতে পারব না। নারীকে এইভাবে আত্মার আনন্দে দেখার অভিনব দীক্ষা বঙ্কিমযুগে কেন, রবীন্দ্রভাবনা-দীপ্ত অতি আধুনিক যুগেও একান্ত বিরল। ভাবুকতার ছদ্মবেশে কামই প্রশ্রয় পেতে পারে এ কথা স্মরণ করেই বঙ্কিম বোধ হয় তাঁর কল্পনার রাশ টেনে ধরেছেন।

"সীতারাম মনে মনে সেই মহিমময়ী সিংহবাহিনী মূর্তি পূজা করিতে লাগিলেন"—এই মানস-পূজা, এই মানস-ধ্যানই প্রেম। এ দেহভোগের বাসনা নয়, আত্মানুভূতির আনন্দ।

দেহাত্মবাদিতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখেছেন বলে কবি শ্রীমোহিতলাল এই মানসধ্যানের অন্য রকম ব্যাখ্যা করেছেন।—তিনি বলেন—"বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে, নিজের জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—রূপজ মোহকেই একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছেন, ব্যধির নাম পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। কারণ, কিছু পরেই বলিতেছেন, স্নেহ

ভালবাসা যেমন পুরাতনেরই প্রাপ্য, তেমনই নূতনের নূতন বলিয়াই একটা আদর আছে। ......এই নূতন যে কি, তাহা কি আর বুঝাইবার প্রয়োজন আছে? নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল এই নূতনেরই সেবা করিয়াছিল—ইহারই স্রোতে ভ্রমর সূর্যমুখী ভাসিয়া গিয়াছিল।"

এ ব্যাখ্যায় রূপের নূতন ও গুণের নূতনের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করা হয় নি, এবং সেই জন্যেই সীতারামের শ্রী-মূর্তির পূজা অর্থাৎ প্রেমধ্যানের যথাযথ তাৎপর্য এতে ধরা পড়েনি বলেই আমাদের ধারণা। সীতারামের কাছে শ্রী যে অর্থে নূতন, কুন্দ বা রোহিনী, নগেন্দ্র বা গোবিন্দলালের কাছে কখনই সে অর্থে নূতন নয়। দেহ-বুদ্ধিতেই মোহিতলালের ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ থাকার জন্যে পার্থক্যটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

সিংহবাহিনী-মূর্তিতে শ্রী সীতারামের চিত্তের নিভৃতলোকে এক মায়ার জগৎ রচনা করেছে। উভয়ের মধ্যে কৌশলে দূরত্ব রচনা করে বঙ্কিম সীতারামের মধ্যে একটা ধ্যানের আকাশ সৃজন করেছেন। শ্রীকে নিয়ে সীতারাম তাঁর জীবনের আদর্শ নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন। শ্রীর মধ্যে তাঁর আত্মোপলব্ধি ঘটেছে। নন্দা ও রমার মধ্যে এই আত্মোপলব্ধির অবকাশ ছিল না।

শ্রী সীতারামের পরিণীতা স্ত্রী। দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যেই বঙ্কিম প্রেমের এই রমণীয় চিত্রটি এঁকে দেখিয়েছেন, দাম্পত্য সম্বন্ধের বাইরে এমন কোন ছবি আঁকেন নি। কারণ সংযম-অসংযমের প্রশ্ন এখানে খুব সমস্যার বিষয় হয়েই দেখা দিয়েছে। তাই অনধিকারীর কাছে এ একটা আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয় যেন না হয়ে ওঠে, তাই বঙ্কিম দাম্পত্য-সম্বন্ধ বহির্ভূত কোন পটভূমি আঁকেন নি। সীতারামের পতনের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা ধ্যানের বিষয়, যা আত্মিক, একই সঙ্গে তা যদি দেহের ক্ষুধাও জাগায়, তবে সুস্থ দাম্পত্য জীবন ছাড়া তার সমন্বয়ের ক্ষেত্র কোথায়?

—"দুই মোহ একত্রে মিশিলে কোন অসিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে?"—সীতারামের পতনের মধ্য দিয়ে এই কথাই বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন। শ্রীকে নিয়ে সীতারামের যে ধ্যান, যে প্রেম-পূজা—শ্রীর সৌন্দর্য সে প্রেমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। কাজেই যেখানে সুস্থ ভোগের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান নেই সেখানে অধিকারীর পক্ষে প্রেমের এই ধ্যান বিকারেরই সৃষ্টি করবে।

এই সঙ্গে আরও একটা কথা বললেন বঙ্কিম। প্রেম-ধ্যান কতক্ষণ স্থায়ী? ব্যক্তিকে নিয়ে যে ধ্যান, সে-ব্যক্তির তো ইহ-জীবনেই নানা জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে

দিয়ে বহু পরিবর্তন দেখা যায়। সে পরিবর্তনে ধ্যানও কি নষ্ট হয় না? ব্যক্তিকে নিয়ে আত্মোপলব্ধির অন্তরায়ও তো সেইখানে। এর চেয়ে ঈশ্বরে ভক্তিই তো শ্রেয়।

নারী-প্রেমে আত্মোপলব্ধি, তথা ঈশ্বরোপলব্ধির যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, নিজেই যেন তা আবার ফিরিয়ে নিলেন। বললেন: ঈশ্বরে মন দীক্ষিত হলে, তবেই চিত্ত শুচি হয়; শুদ্ধ অনুশীলিত চিত্তেই পবিত্র প্রেম সম্ভব। প্রেম পবিত্র হলে ব্যক্তি ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান হয়ে দেখা দেয়—[দেবী চৌধুরাণী]। লক্ষ্য তাই ঈশ্বর; কিন্তু ব্যক্তিই তার আশ্রয়। ঈশ্বরে ভক্তি ও ব্যক্তিতে প্রেম জীবনের একই বিকাশ। ভক্তির অভাবই প্রেমের বিকার।

রবীন্দ্রনাথ এখানে, বাইরের ব্যক্তি যেমনই হোক না কেন, আত্মানুভূতির আনন্দে ভাবের ভুবনে তাকে রচনা করে নেওয়ার কথা বলেছেন। এ রচনা দেহ-লোলুপের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তার চাহিদা ভিন্ন। প্রেমই ভাবের ভুবন রচনা করে নেয়। ব্যক্তি এখানে উপলক্ষ মাত্র, নৈর্ব্যক্তিক আনন্দই সেখানে আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সংযম সেখানে স্বভাব-সুন্দর, বৈধ-অবৈধের প্রশ্নও সেখানে তাই অবান্তর। কবিগুরু একেই বলেছেন বিকশিত কাম। জৈব কাম থেকে এ সম্পূর্ণ পৃথক বৃত্তি। 'মহুয়া' এই প্রেমেরই অভিনব সঙ্গীত, এবং 'রক্ত করবীর' বিশু চরিত্রে এই প্রেমেরই দিব্য প্রকাশ। ['রবীন্দ্রনাথের মহুয়া' ও 'কবিগুরুর রক্তকরবী' দ্রষ্টব্য]

প্রেমের ভাবে ও ভাবনায় বঙ্কিম থেকে দেশ ও যুগ যদি কিছু এগিয়ে থাকে তবে তা এই পথে—রবীন্দ্র-প্রেম ভাবনার আনন্দময় মুক্তি-চেতনায়। এর পাশে দেহ-ভোগের সমর্থনে প্রেমের যত আধুনিকতাই প্রকাশ করি না কেন, তার মধ্যে সুর ও রঙের হয়তো বিচিত্রতা আছে কিন্তু বোধের দিক দিয়ে কোন অগ্রগামিতা নেই। সেইজন্যেই তা যথার্থ আধুনিক নয়; দুর্বল ভোগের বহু পরিচিত পুরাতন ইতিবৃত্ত মাত্র।

পরিপূর্ণতার সুরে জীবনকে বেঁধে নিতে চেয়েছেন বলেই বঙ্কিম প্রেমের বিকারগুলিকে সমর্থন করেন নি। মোহ বেদনার মধ্যে দিয়ে জীবনের যে উদ্‌ভ্রান্ত প্রকাশ, বঙ্কিম শিল্প-নৈপুণ্যে তাকে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু স্বীকার করেন নি। বেদনার নানা দহনের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম-সাহিত্যে এই পরিণামের যে কয়েকটি চিত্র আছে, গোবিন্দলাল—অমরনাথ—সীতারামের সেই জীবনা-লেখ্যগুলি,—তাতে প্রেম ও ভক্তি,—মানব ও ঈশ্বর,—সান্ত ও অনন্তের

মধ্যবর্তী যোগসূত্রটি প্রায়ই অনুপস্থিত। তত্ত্বের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধটি স্পষ্ট অনুভব করি, জীবনায়নের দিক থেকে তা যেন অনেকটা যুক্তি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত, বেদনাবোধ দিয়ে নয়। তাই পরিণামটি জ্ঞানে বুঝি মাত্র, কিছুটা ভারতীয় সংস্কারে স্বীকারও করি, কিন্তু পথটা অভিজ্ঞতার অভাবে জীবনবোধে স্পষ্ট অনুভব করি না। তার জন্যে আজকের জীবনভূমি থেকে বঙ্কিমের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ বলে গাল দিতে পারি, বলতে পারি,—"He is a moralist rather than an objective artist....He is not a realist who records life impersonally as he finds it, but a romantic who transforms life according to his ideals. [Bengali Literasure—J. C. Ghosh.]; কিন্তু জীবনের সত্যকে অস্বীকার করেছেন বঙ্কিম, অবাস্তব, অমনস্তাত্ত্বিক কথা বলছেন, শ্রদ্ধা নিয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করলে এ কথা কখনই বলা চলবে না। আদর্শের সঙ্গে যেখানে মিল নেই সেখানেই অধৈর্য হয়ে গাল পাড়ব, বলব—"Bankim is always the typical bourgeois, smug, sentimental, didactic, and conservative, and the world he creates is as narrow as it is false." [J. C Ghosh]

—আর মতবাদে মিললেই করতালি দিয়ে আকাশ ফাটবো, এ রকম সস্তা মুরুব্বিয়ানা ত্যাগ করার দিন আজ এসেছে। সে পণ্ডিতম্মন্যতা আপনার উচ্চভাষণে যতই স্ফীত হোক না কেন, জীবনের অগ্রগামিতায় দেশ ও জাতি বঙ্কিমের কাছেই দীক্ষা নেবে, 'হাউইয়ে'র সে স্পর্ধায় কর্ণপাত করবে না। আমরা জানি জীবনের পরিবেশ আজ বিচিত্র ও জটিল, আমরা মানি জীবনের চাহিদা আজ প্রমত্ত ও প্রখর, আমরা বুঝি সাধনার পথ আজ রুক্ষ ও দুর্গম। কোন একটি সাময়িক সমস্যা যেমন চিরকালের সমাধান নিয়ে আসতে পারে না, তেমনি কোন এক বিশেষ সমাধান চিরকালের সমস্যার সম্মুখীন হতেও পারে না। জীবনের গতিকে স্বীকার করলে যুগের বিচিত্র পটভূমিকেও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সেই স্বীকৃতি তখনই সমাধানের সূর্যালোক দেখে, যখন দুর্যোগের তিমির রাত্রে সন্ধ্যাদীপের মতই তার বিনম্র তপস্যা ; দেশ ও জাতির চিরন্তন ভাবনায় যে তপস্যা সত্য এবং বাস্তব। দেশ ও জাতির সেই চিরন্তন ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে বাস্তবনিষ্ঠা নিয়ে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় নিলে আজকের নানা সমস্যার মধ্যেও সমাধানের পথ-নির্দেশ পাব বলেই আমাদের ধারণা।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প-চেতনা

বঙ্কিম প্রতিভার পরিচয় নিতে গিয়ে আমরা দেখি যে, যুগ-ভেদে যেমন জীবন-বোধের (Fundamental norm and values of life) ভেদ ঘটেছে, তেমনি রীতির পার্থক্যে রুচির-ও ভেদ ঘটেছে। জীবনবোধের ক্ষেত্রে যদি মহৎ সাহিত্যের ধর্মটি শিল্পী প্রকাশ করতে পারেন, তবে চিরন্তনের রস-রূপায়ণে তিনি যুগের বিক্ষুব্ধ সংশয় ও সন্দেহকে স্বীকার করেও অতিক্রম করে যান। মহৎ সাহিত্যের এই প্রকৃতি সম্বন্ধে কবিগুরু বলেন যে, সুন্দরের প্রতি, সত্যের প্রতি, মহতের প্রতি, আমাদের চিত্তকে আবিষ্ট করা ও অনুরাগ সঞ্চার করা হল মহৎ সাহিত্যের কাজ। এই অনুরাগ যে বঙ্কিম আমাদের মধ্যে জাগাতে চেয়েছেন তাঁর জীবন-চেতনার পরিচয়ে সে কথাই আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি।

এই অনুরাগের দান গ্রহণ করতে হলে প্রতিভার রচনাকে সমগ্রভাবে দেখার প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে শিল্পীর প্রয়াসটিকে প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে তার সামগ্রিকতার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করা যায়। যাঁরা রসবাদী সমালোচক, তাঁরা সাহিত্যিকের রচনাকে কোন ছাঁচের মধ্যে ফেলে টুকরো টুকরো করে বিচার করতে চান না। কেউ বা ছাঁচের পাট একেবারেই তুলে দিতে চান। বলেন :

"উৎকৃষ্ট রস-প্রেরণা বা কবির রস-দৃষ্টি যাহা সৃষ্টি করে তাহার কোন সংজ্ঞা নাই।"

কিন্তু তাকে চেনবার উপায় কি ? উত্তর হল—

"জীবনই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য। সেই জীবনের কোনও 'রূপ' যখন 'বাণী' হইয়া উঠে তখনই তাহা সাহিত্য হয়। উৎকৃষ্ট কবি-প্রেরণার যে বাণী তাহাতে জীবন বা ভাবগত সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে। ··সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে, ব্যক্তি-প্রতিভা, এবং জীবনকেই যে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে সেই তত বড় ব্যক্তি—তাহার যে বাণী তাহাই উৎকৃষ্ট style, তাহাই great art—['বঙ্কিমবরণ'—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার]।

'রসরূপ, বা 'বাণীভঙ্গী' কথাটি এতই abstract যে, সাহিত্যের বিভিন্ন শিল্প-বিভাগের বৈচিত্র্যধর্মিতা এতে লোপ পায়। অথচ নাটক, কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি জাতি নির্ণয়ের প্রয়োজন অনেকেই স্বীকার করবেন। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে জাতি বিচার এবং অঙ্গ-বিভাগই আবার অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করে। জীবন-দর্শনের সমগ্রতার ওপর জোর না দিয়ে শিল্পের বিচিত্র অঙ্গ-বিন্যাসের দিকেই সে ক্ষেত্রে সমালোচক দৃষ্টি রাখেন। সমালোচক সেখানে কবির কোন জীবনদর্শনের ভূমি থেকে শিল্পকে গ্রহণ করেন না। কবি সম্বন্ধে কোন পূর্ব সংস্কার না রেখে objective দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই কবিকে বিচার করেন। সেইজন্যে শিল্পের নিখুঁত রূপটির মানদণ্ডেই কবিকে পুরস্কৃত করেন, জীবন-চেতনার কোন দার্শনিক মূল্যায়নের দিক থেকে নয়। শিল্পের এই আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণে আমরা কবিকে পাই না, পাই একজন কারিগরকে।

কবিত্ব আর কারিগরীর মধ্যে তফাৎ বিস্তর। কারিগরী বোঝার জন্যে যদি বিশ্লেষণ পদ্ধতি, তবে, কবিত্ব আস্বাদের জন্যে প্রতিভার ধ্যানজগতের সুদূর রহস্য-লোকের স্বরূপ সন্ধান। সংশ্লেষণী দৃষ্টির দূরবীক্ষণে রসবাদী সমালোচক প্রতিভার সেই রহস্যালোক আবিষ্কার করেন, যা সকল শিল্পের অদৃশ্য কারখানা,—"যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ করে আছে।" [সাহিত্যের পথে—'সাহিত্যতত্ত্ব' : রবীন্দ্রনাথ]। এই ধ্যানের জগৎ অনুসন্ধানে তাঁরা কোন ছাঁচের পূর্ব-সংস্কার নিয়ে আসেন না, প্রতিভার সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করে তাঁর ধ্যানের গভীরতা আস্বাদন করেন। এঁদের সাহিত্য-বিচার তাই বিশ্লেষণ নয়, ব্যাখ্যা।

বঙ্কিমের শিল্প-চেতনা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ অথবা ব্যাখ্যা কোন পথ আমরা গ্রহণ করব, এ নিয়ে দ্বিধা আসতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা একটা সূত্র নির্ণয় করতে পারি যে, যে-সৃষ্টি প্রতিভাবানের, অর্থাৎ যা যুগোত্তীর্ণ, তাকে নিয়ে ব্যাখ্যা; আর যা প্রতিভার রচনা নয়, তাকে নিয়েই বিশ্লেষণ।

প্রতিভার সৃষ্টি চলমান জীবনের সঙ্গে গতি লাভ করে। জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিত্য নূতন মনের সংস্পর্শে তার নিত্য নূতন রূপ দেখা দেয়। জীবনের রহস্যময় গভীর প্রাণস্পন্দ তাতে ধরা পড়ে এবং তা জীবনধর্মী হয়ে উঠে গভীর রহস্য ও আনন্দের উৎসে পরিণত হয়। মহৎ সাহিত্য তাই প্রাকৃতিক বিষয়ের মতই আপনাতে আপনি সমৃদ্ধ, কোন বিশেষ নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে তার বিশ্লেষণ করা

চলে না, তার ব্যাখ্যাই তাকে বোঝার উপায়। কিন্তু যে-শিল্প এই প্রকৃতি-ধর্মী স্বাভাবিকতা লাভ করতে পারে না, যার মধ্যে অনুকরণ ও চেষ্টাই প্রবল, যা গভীর কোন জীবন-ধ্যান প্রসূত নয়, তার শিল্পের প্রয়াসটাই মূলধন বলে তা বিশ্লেষণেরই অধীন।

শিল্প-বিষয় বিশ্লেষণের অধিকারে আছে কি ব্যাখ্যার গভীরতায় আছে, তা নির্ণয় করাই সমালোচকের প্রথম কাজ। ব্যাখ্যার বিষয়কে বিশ্লেষণের কঙ্কর ভূমিতে নামিয়ে আনা, অথবা বিশ্লেষণের বিষয়কে ব্যাখ্যার আকাশে তুলে ধরা, উভয় ক্ষেত্রেই সমালোচকের মোহমুক্ত দৃষ্টির অভাব ঘটে। মহৎ সাহিত্যের প্রয়াস বিশ্লেষণের সম্মুখীন হয়ে অনেক সময় বিড়ম্বিত হয়। প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করে যদি তার ব্যাখ্যা না করি, তবে তার নিজস্ব আন্তর-সঙ্গতি ধরা পড়ে না।

এক গভীরতর জীবন-চেতনা বঙ্কিম সাহিত্যের পটভূমি। তাই প্রয়াসকে প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে বঙ্কিমের শিল্প-চেতনায় বাস্তব ও কল্পনার বুননটি আমরা ঠিক বুঝতে পারব। বাস্তবের বিশ্লেষণ নয়, কবি-কল্পনার ব্যাখ্যাও বঙ্কিম-সাহিত্য-বিচারে তাই বিশেষ প্রয়োজন।

অথচ উপন্যাসকে যাঁরা বাস্তবানুগামিতার প্রকাশ বলে মনে করেন, বঙ্কিমের সাহিত্য বিচারে তাঁরা স্বতঃই বিশ্লেষণমূলক পন্থা গ্রহণ করেন। সে ক্ষেত্রে কারিগরী-শক্তির এবং সেই সঙ্গে বাস্তবতার তার-তম ভেদেই প্রতিভার মূল্যায়ন। শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণে "প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা"র উপরেই জোর দিয়েছেন। বাস্তবতার তীব্রতা (দীনবন্ধুর 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রসঙ্গে), সূক্ষ্মতা-ব্যাপকতা-গভীরতা (রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে), নির্মমতা ('চরিত্রহীন' উপন্যাসে আরাকাণের চিত্র প্রসঙ্গে), এবং উদগ্রতা (অতি আধুনিক উপন্যাস প্রসঙ্গে) বিচার করে উপন্যাসের উপজাতি-বিচার ও তর-তম-ভেদ করেছেন। কিন্তু এতে 'বাস্তব' শব্দটি সংজ্ঞার দিক দিয়ে নির্দিষ্ট মাপকাঠির মূল্য লাভ করেনি। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একই সঙ্গে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি থেকে 'বাস্তব' সম্বন্ধে অস্পষ্টতারই পরিচয় পাই। শ্রীকুমারবাবু বলেন, বাস্তবস্তার প্রবর্তনেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার প্রথম পরিচয়। ...এই গভীরতর বাস্তবতাই বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের প্রধান হেতু"

অথচ এই গভীরতর বাস্তবতার ধারা যখন উগ্রতর ও তীব্রতর বাস্তবতার ধারায় পরিণতি লাভ করে নি তখন, "রবীন্দ্রনাথ বোধহয় অজ্ঞাতসারেই

সেই পুরাতন ধারার অনুবর্তন করিয়াছেন। বাস্তব যুগের আবহাওয়ায় পরেশবাবু তাঁর অলৌকিকত্ব বর্জন করিয়াছেন, কিন্তু মহাপুরুষের সাধারণত্ব ও দুর্জ্ঞেয়তা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।”

কারণ বোধহয় এই যে—

“আমাদের জনবহুল পল্লীগ্রাম, দ্বন্দ্ববহুল সংসার ও পরিবার, দারিদ্র্য ও ঈর্ষা-বিদ্বেষের খরতাপক্লিষ্ট জীবনযাত্রা—ইহাদের অন্তর্নিহিত ‘প্রখর বাস্তবতা’ হইতে তাঁহার সৌন্দর্যপ্রিয় কবি প্রকৃতি সংকুচিত হইয়াছে।···অসাধারণত্বের প্রতি কবি-প্রতিভার যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহা তাঁহার উপন্যাসকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে ঠিক আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সাধারণ জীবনের সমদুঃখভাগী বলিয়া মনে করা যায় না।’

বাস্তবানুগামিতাকে মুখ্য করে তুললে আমরা উপন্যাসের উপজাতির গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলি এবং কবি-কল্পনা থেকে অনেক দূরে সরে যাই। তখন কোন এক উপবিভাগের বিশেষ ধর্ম সমগ্রের ধর্মকে আচ্ছন্ন করে। উপন্যাস রচনায় কবি-কল্পনার গুরুত্ব শ্রীকুমার বাবুও অস্বীকার করেন না। তিনিও বলেন, ‘যে-উপন্যাস কেবল বাস্তব বর্ণনাতেই পর্যবসিত, যাহা দৈনিক তুচ্ছতার উপর কল্পলোকের রঙ্গীন আলোক ফেলিতে পারে না, তাহার স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে।”

কিন্তু, ‘প্রকৃত জীবনের ছবি’ এবং ‘কল্পলোকের রঙ্গীন আলোকে’ রঞ্জিত ‘বৃহত্তর ব্যাপকতর সত্যের বোধ’, একই বাস্তবের ফ্রেমে আঁটা যায় না। কারণ কবি-কল্পনায় ব্যাপকতা ও গভীরতার সীমা ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া চলে না। ‘কল্পলোকের রঙীন আলোকে’ ‘প্রকৃত জীবনের’ একটা রূপান্তর দেখা দেবেই। সেই রূপান্তরে জীবনের চিত্র আর বাস্তবানুগামী হয় না, কবির কল্পনানুগামী হয়। সেই কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে জীবনের বাস্তব সাহিত্যের বাস্তবে মূর্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের সেই বাস্তবের বিচার সের দরে বা ফুট হিসেবে নয়। “সাহিত্যে ও আর্টে কোন বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে-বস্তু যদি এমন একটা রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে করে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব’লে স্বীকার ক’রে নেয়, তাহলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। [সাহিত্যের পথে—‘তথ্য ও সত্য’] এ প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের উক্তিটিও খুব বলিষ্ঠ—

‘‘জীবন অর্থে যে কেবল বাস্তবজীবন, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে জীবন হতে হবে এমন

প্রয়োজন নাই। শিল্পী তাঁর চেতনায় তাঁর প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে যে জিনিষ যতখানি সজীব করে ধরেছেন, তাই তত সত্য তত বাস্তব—স্থূল, ভৌতিক সত্য বা বাস্তবের সাথে তার সম্বন্ধ সংযোগ কি সাদৃশ্য নাই থাকুক।...জীবনের কথা হলেই যে তা জীবন্ত হয়ে উঠবে এমন নয়। আধুনিকের অতি বাস্তবতার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীনের রূপকথা বেশি বাস্তব।"

অথচ উপন্যাসের মধ্যে জীবনের রূপ-চরিত্রের একটা বিশেষ নক্সা আছে, একটা আলাদা ছাঁচ ও ধাঁচ আছে, একথা অস্বীকার করতে পারি না। পৌরাণিক কাহিনী বা রূপকথা থেকে উপন্যাসের একটা প্রেরণাগত ও শিল্পাদর্শগত পার্থক্য আছে। সে ক্ষেত্রে উপন্যাসের একটা বিশেষ পরিচয় নির্দেশ করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কবি-কল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা তাই বলতে চাই যে, ঔপন্যাসিক 'বাস্তব-বুদ্ধির' বশবর্তী হয়ে উপন্যাস রচনা করেন না, সমাজ চেতনার অধীন হয়েই উপন্যাস রচনা করেন। সমাজ জীবনের পটভূমিকাই ঔপন্যাসিকের কবি-কল্পনার বাস্তব ভিত্তি। তা কবি-কল্পনাকে প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

আমাদের জীবনের সুখদুঃখগুলি সমাজ জীবনের ভূমিকায় বিচিত্র স্ফূর্তি লাভ করছে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাবনা-চিন্তা, কর্মের প্রচেষ্টা এবং প্রেমের উদ্দীপনা এক সামাজিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রকাশের আবেগে জীবন একটা রূপ পেতে চায়, সমাজ শক্তির প্রভাবে তা আর একটা আকার ধারণ করে। সমাজ-শক্তিই আমাদের জীবনের বাস্তব ভূমিকা অনেকখানি রচনা করে দেয়। এরই জন্যে আমাদের জিজ্ঞাসা জ্ঞানে, চীকির্ষা কর্মে, বাসনা প্রেমে পরিণত হয়। এই সমাজ-জীবনের ভূমিকায় ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্বগুলি যিনি আবিষ্কার করেন, তিনিই ঔপন্যাসিক।

যুগ-ভেদে এবং শিল্প-ভেদে এই সমাজ-চেতনার যেমন ভেদ, ঔপন্যাসিকের রচনায় 'প্রকৃত জীবনের ছবি'রও তেমনি ভেদ। জীবনের সেই চিত্র-ভেদে উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপজাতি বিভাগ হয়তো করতে পারি, কিন্তু উৎকর্ষ অপকর্ষের কোন চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে আসতে পারি না। উপন্যাসের মধ্যে জীবনের যে শিল্পায়ণ তার বিচার বাস্তবতার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে সম্ভবও নয়। শিল্পী যেখানে সচেতন ভাবে সেই আদর্শেই শিল্প রচনা করছেন, সেখানে এই তথাকথিত 'বাস্তবে'র মানদণ্ডে শিল্পের পরিচয় নেওয়া যায়, কিন্তু শিল্পীর মনে যদি জীবনের এবং সেই হেতু শিল্পের পৃথক আদর্শ থাকে তবে উপন্যাসের সংজ্ঞাকে

বাস্তবতার সূত্রে সীমিত করে প্রতিভার রচনাকে ছাঁটাই করার চেয়ে, শিল্পীর কবি-কল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পৃথক শিল্পাদর্শ আবিষ্কার করাই আমরা শ্রেয় বলে মনে করি। শিল্পীকে বোঝার জন্যেই শিল্প-তত্ত্ব, শিল্পীকে বাতিল করার জন্যে নয়। বাস্তবতার বিশেষ মানদণ্ডে বঙ্কিমের উপন্যাসের যে পরিচয় পাই তাতেও আংশিক ভাবে বঙ্কিমের প্রতিভাই স্বীকৃত হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বঙ্কিমের পরিচয় নিতে হলে বাস্তবতার মাপকাঠিকে আমাদের ছেড়ে আসতে হবে। জীবনকে বঙ্কিম যেভাবে দেখেছেন বা দেখাতে চেয়েছেন, তারই শিল্পরূপের ব্যাখ্যায় ভিন্নতর মাপকাঠির প্রয়োজন্ আছে বলেই আমাদের ধারণা। উপন্যাসের সংজ্ঞা আমরা তখন সেইদিক থেকে নির্ণয় করব। আমরা তাই বলতে চাই, ব্যক্তি জীবনের কাহিনী যখন সমাজ জীবনের পটভূমিকায় একটি সুসঙ্গত অর্থপূর্ণ পরিণত [এরিষ্টল্ যাকে বলেছেন, complete in itself] রূপ লাভ করে, তখনই তা উপন্যাস হয়ে ওঠে। এই সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষাই উপন্যাসের শিল্প-মূর্তির বিশিষ্টতা। সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম তাঁর কল্পনাকে কি কৌশলে রূপ দিলেন, বঙ্কিম সম্বন্ধে এই হল আমাদের জিজ্ঞাসা।

২

মানবিক পরিপূর্ণতার (perfection) আকাঙ্ক্ষাই বঙ্কিমের কবি-কল্পনা, আর আমাদের অনুশীলন-বিবর্জিত, ধর্মচেতনা-বিরুদ্ধ অসম্পূর্ণ মানব-প্রকৃতি তাঁর কল্পনার বাস্তব আশ্রয়। এক বিশেষ শিল্পাদর্শে এই বাস্তব ও কল্পনার নিপুণ বুনন আমরা দেখতে পাই।

বঙ্কিমের বাস্তব-নিষ্ঠা ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, আর কবি-কল্পনা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সংযোগে বঙ্কিম উপন্যাসের আদর্শ-ই রক্ষা করেছেন। তাঁর শিল্পে সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের একটি নিটোল মূর্তি গড়ে উঠেছে।

ঘটনা-বিন্যাসেই বঙ্কিমের বাস্তব-নিষ্ঠা। ঘটনাকে নিপুণ অস্ত্রের মতন ব্যবহার করে বঙ্কিম কল্পনাকে কুঁদে কুঁদে মূর্তি তৈরী করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে ঘটনার তাই বিশেষ গুরুত্ব। মানুষ যে ঘটনার অধীন, অদৃশ্য নিয়তির মতই যে তা' মানুষকে চালিত করে, ঘটনাই যে জীবনের আয়ত্তাতীত রূঢ় বাস্তব, বঙ্কিমের

উপন্যাসে সে পরিচয় আমরা পাই। হয় তো এর পেছনে পাশ্চাত্য সাহিত্যা-দর্শের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। তবু আমাদের অসংযত চিত্তবৃত্তি যে বহুবিধ জটিল ঘটনা-জাল রচনা করতে থাকে, জীবনের কঠিন বাস্তব রূপে তা' অবশেষে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে জীবনের পথ রোধ করে, বঙ্কিম তা দেখিয়েছেন। ঘটনার সূচনায় ও বিকাশ বঙ্কিম বাস্তবকেই অনুসরণ করেছেন। সেখানে ঘটনাপ্রবাহ যুক্তিসঙ্গত কার্যকারণ সূত্রে দৃঢ়-সম্বন্ধ। ঘটনা থেকেই সেখানে ঘটনার উদ্ভব, ঘটনার নিয়মেই সেখানে জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ। সেখানে বাস্তবে যেমনটি হয়, বঙ্কিম তাই ঘটিয়েছেন। জীবনে ঘটনার আকস্মিকতাকে বঙ্কিম যেমন অস্বীকার করেন নি, তেমনি ঘটনার দ্বারাই চরিত্রের মনোজীবনের গোপন গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস বিচার করলে আমরা দেখি, সর্বত্রই কোন না কোন ভাবে আকস্মিক ঘটনা বা Accident এর অবতারণা বঙ্কিম করেছেন। এই Accident এর প্রাধান্য থেকেই বুঝি, জীবনের চিত্রকে বঙ্কিম বাস্তবের ভিত্তি থেকেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। Accident এর মধ্যে দিয়েই কল্প-লোকের শূন্যতা থেকে জীবনের কঠিন বাস্তব ভূমিতে কাহিনীর বীজ উপ্ত হয়েছে।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং বিষবৃক্ষ—এই তিনটি উপন্যাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূর্তিতেই Accident-এর অবতারণা। জগৎসিংহ, নবকুমার এবং নগেন্দ্রনাথ—এঁদের জীবনের বিচিত্র কাহিনীর সূচনা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়েই। আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি যে একজন মূক নিয়ন্তা, একথা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। প্রকৃতির অদৃশ্য হস্ত আমাদের জীবন-তরীর হালকে অনেক সময় ভিন্ন মুখে ঘুরিয়ে দেয়, জীবনের নবতর কাহিনী শুরু হয়। প্রাকৃতিক শক্তির এই প্রভাবকে একান্ত বাস্তব জেনেই বঙ্কিম কয়েকটি উপন্যাসের ভিত্তিমূলে তাকে স্থান দিয়েছেন।

আনন্দমঠ ও সীতারাম, এই দুইটি উপন্যাসে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখানে প্রাকৃতিক শক্তি নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা বীভৎস বিকার রুদ্র প্রকৃতির মতই প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। কল্যাণীকে ঘিরে নর-মাংসলোলুপ মনুষ্য-প্রেতদের নৃত্য, রুদ্র প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যকেই প্রকাশ করেছে, এবং গঙ্গারামের জীবন্ত কবরের দৃশ্য ঝড়ের মুখে তৃণ-খণ্ডের মত জীবনকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করেছে।

ইন্দিরা ও দেবীচৌধুরাণীতে আকস্মিক ঘটনা সাধারণ দুর্ঘটনার মতই উপস্থিত

হয়েছে। এমন দুর্ঘটনাও জীবনে অসম্ভব নয়। উপন্যাসের কাহিনীকে বাইরে থেকে একটা গতি দেওয়াই এর কাজ। তবে জীবনের গভীর ব্যাখ্যা নেই বলে এ রকম Accident অক্ষম লেখকের হাতে দুর্বল হয়ে পড়ে। নিপুণ শিল্পী একে মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে যুক্ত করে দেন।

ঘটনার আকস্মিকতা জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সাক্ষ্যস্বরূপ। কিন্তু এ যদি চরিত্র-নিরপেক্ষ হয়ে দেখা দেয় তবে এতে শুধু ভয় ও অসহায়তার বোধই জাগে, জীবনের গভীরতার ও রহস্যের কোন ব্যাখ্যা মেলে না। চরিত্রের মনোজীবনের কোন একটি বিশেষ পরিচয় যখন আকস্মিক ঘটনার সৃষ্টি করে, তখন সেই Accident শুধুমাত্র বাহিরের শক্তি হিসাবেই নয়, জীবনের গভীর রহস্যরূপেই দেখা দেয়। যে ঘটনা বাইরে থেকে সমায়াত হয়, বহিশ্চেতনাকে প্রভাবিত করে, উদ্‌ভ্রান্ত করে, তার প্রসার ও প্রভাব সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে বিপুল ও প্রবল বলে প্রতীয়মান হলেও গভীরতা (intensity) তার খুবই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু চরিত্র থেকে, অন্তর্জীবনের অতলান্তিক ভাববেদনা থেকে যে ঘটনা ঘটে, তার স্পন্দন যদি মৃদুও হয়, তবু তা অন্তস্তল পর্যন্ত আলোড়িত করে, জন্ম জন্মান্তরের গভীরে তোলে তরঙ্গ।

চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রাজসিংহ, এই কয়টি উপন্যাসে Accident চরিত্রের মনোভাব এবং আচরণ থেকে উদ্ভূত। গঙ্গাবক্ষে কিশোর কিশোরীর সন্তরণ এবং প্রতাপের নিমজ্জন যে আকস্মিক ঘটনার সৃষ্টি করেছে, উভয়ের মানসিক অবস্থাই তার কারণ। 'রজনী' উপন্যাসের শচীন্দ্রের স্নেহমধুর স্পর্শই অতি মৃদু স্পন্দন তুলে এক গুরুত্বপূর্ণ Accident এর সৃষ্টি করেছে, অন্ধ নারীর জীবনে ঘটনার দিক থেকে কোনমতেই যা তুচ্ছ নয়। অন্ধ রমণীর প্রণয়োন্মেষের একটি রস-ঘন আবেশ-মধুর মুহূর্তই Accident এর রূপ গ্রহণ করেছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' Accident কোনখানে ?— রোহিণীর দ্বিতীয়বার সিন্দুকের চাবী ঘোরানোর শব্দে। রোহিণীর প্রণয়-ভীরু হৃৎপিণ্ডের গোপন স্পন্দন ওই যান্ত্রিক ধাতব শব্দের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজসিংহ উপন্যাসে আওরঙ্‌জেবের তস্‌বীরের ওপর নির্মলকুমারীর পদাঘাত মনোজীবনের গভীর উৎস থেকে উদ্ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। যথেচ্ছাচারী মোগল সম্রাটের দম্ভ ও প্রতাপের উপর রাজপুত আত্মাভিমানের এই আঘাত সমগ্র কাহিনীকে ঠেলা দিয়ে পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে প্রস্তরখণ্ডের মত গড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এইরূপে দেখি, জীবনের কাহিনী বঙ্কিম বাস্তব ঘটনার দৃঢ়ভিত্তির উপরেই গড়ে তুলেছেন। এই যেমন ঘটনার সূচনায় বাস্তব নিষ্ঠা, তেমনি ঘটনার বিকাশেও বাস্তবতাকেই রক্ষা করেছেন বঙ্কিম। ঘটনা থেকেই ঘটনা ঘটেছে এবং জীবনে যেমনটি ঘটে, কার্যকারণ যোগসূত্র রক্ষা ক'রে ঠিক তেমনটি ঘটিয়েছেন বঙ্কিম। ঘটনা ঘটলে তার মধ্যে বস্তুধর্মী অনিবার্যতা দেখা দেয়। জীবনের ঘটনা তখন প্রাকৃতিক ঘটনার মতই পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং অবশ্যম্ভাবী। ঘটনার এই অনিবার্যতাকে এবং অবশ্যম্ভাবিতাকে বঙ্কিম অস্বীকার করেন নি, লেখক বঙ্কিম নেপথ্যে দাঁড়িয়ে ঘটনা থেকে যা ঘটে তা ঘটতে দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথ তার মোহকে অনুসরণ করে কুন্দকে বিবাহ করেছে, রোহিণী যথারীতি তারকেশ্বরে হত্যা দেবার ছল করে গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রসাদপুরে মিলিত হয়েছে, বেদগ্রামের কুটির ছেড়ে জ্বলন্ত বহ্নির দিকে উন্মুখ পাখা বিস্তার করেছে লুব্ধ শৈবলিনী। নাট্যকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বঙ্কিম ঘটনাগুলি সাজিয়ে গেছেন। ঘটনাবিন্যাসে বঙ্কিম এ সব ক্ষেত্রে একান্তই Realist ; এখানে ঘটনা থেকেই ঘটনার ও চরিত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে শিল্পরীতিতে বঙ্কিম ভাস্করধর্মী বলে তাঁর ঘটনা স্থাপন ও চরিত্রস্ফুরণের ভঙ্গী বা টেক্‌নিক একটু বিশিষ্ট। সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর না দিলে উপন্যাসের মধ্যে পরবর্তী অনেক ঘটনাকেই কার্যকারণ-সম্পর্ক রহিত, আকস্মিক বলে মনে হবে ; এবং তার ফলে হয়তো শিল্পের জগতে Realist বঙ্কিমের সৌন্দর্য সৃষ্টিকে Didactic বলে অপবাদ দেব।

মনোজীবনের কোন বিস্তৃত গভীর পরিচয় বঙ্কিম কোন একটি আপাত তুচ্ছ সাধারণ ঘটনাব মধ্যে সাজিয়ে আনতে পারেন। আবেগ যেখানে যত গভীর, প্রকাশে বঙ্কিম সেখানে তত বেশি সংযত। অল্প কয়েকটি কথা এবং সামান্য কিছু আচরণ, এই দিয়ে বঙ্কিম চরিত্রের বিরাট ইতিহাস প্রকাশ করেন। এ যেন শতধা-বর্তমান সূর্যরশ্মিকে আতসকাঁচের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীভূত করে অগ্নি-দীপ্তি দান করা। এতে ঘটনার ভার কম হলেও, ধার খুব বাড়ে। এই ভারহীন ধারালো ঘটনাই বঙ্কিমের নিপুণ ছেনি, যা দিয়ে কেটে কেটে মূর্তি কুঁদে তোলেন।

চেহারা অত্যন্ত সাধারণ এমন ঘটনাগুলি সামনে তুলে ধরে চরিত্রের মনোজীবনকে খানিকটা আড়াল করে রাখেন। যেখানটা ছেনির ঘা দিচ্ছেন, সেখানে মূর্তিটা কেমন ফুটল যেন প্রথমে তা দেখতে দিতে চান না, ঘটনাগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের এমনই অন্যমনস্ক করিয়ে দেন বঙ্কিম।

কুন্দের রূপ বর্ণনা ক'রে নগেন্দ্রনাথের পত্রালাপ এমনই একটি তুচ্ছ অথচ

ধারালো ঘটনা। হরলালের বিধবাবিবাহের প্রস্তাবে রোহিণীর ঘোমটা দেওয়ার মধ্যেই রোহিণী চরিত্রের ব্যাখ্যা। নিস্তব্ধ নিশীথের দিকে চেয়ে চন্দ্রশেখরের নীরব অশ্রু তাঁর গভীর প্রেমের গোপন সাক্ষ্য।

মনোজীবনের পরিচয় ঘটনার মধ্যে দিয়েই উপস্থিত করেছেন বঙ্কিম। সেই উপস্থাপনে অনেক সময় তুচ্ছ অথচ ইঙ্গিতময় ঘটনার অন্তরালে মনোজীবনের ব্যাখ্যা নিহিত রেখেছেন, এবং পরে কোন আকস্মিক প্রকাশের (outbrst) মধ্যে মনোজীবনের পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন। একই চরিত্রের প্রকাশে ঘটনার এই দ্বিবিধ ছন্দঃস্পন্দে একটা contrast বা বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য্যমুখার হাত থেকে আয়না নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে নগেন্দ্রনাথের স্বহস্তে নিজ কণ্ঠরোধ করার আবেগ; মুঙ্গেরের ঘরে প্রতাপকে দেখে শৈবলিনীর মূর্ছার সঙ্গে রণভূমির একপ্রান্তে ধীরকণ্ঠে প্রতাপকে শৈবলিনীর নিষেধ; বাগানবাড়ীতে মৃতকল্প রোহিণীর মুখে ফুংকার দেওয়ার সঙ্গে প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলালের পিস্তলের আওয়াজ; জ্বলন্ত লৌহশলাকা দিয়ে অমরনাথের পিঠেচোর নাম দেগে দেওয়ার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিদায়-কালীন অশ্রু;—এমনই বৈপরীত্যের বিচিত্রতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই বৈপরীত্যের অন্তর্বর্তী মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণের যোগ-সূত্রটি বঙ্কিম বিশেষ কৌশলে সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মনোজীবনের বিবৃতিমূলক দীর্ঘ চিত্র দিয়ে তার উল্লেখ না করে ভাস্কর্য রীতি অনুসারে তা পাঠকের 'দেখার' ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

এই মূর্তি দেখার শিল্পদীক্ষাটি না নিয়ে যদি বঙ্কিমের রচনায় আমরা প্রবেশ করতে যাই তবে একদিকে যেমন বঙ্কিমের স্বল্পভাষণে অতৃপ্ত থাকি, তেমনি যেখানে বিশেষ যত্নের সঙ্গে বঙ্কিম তাঁর মূর্তিকে নিটোল করে তুলছেন, সেখানেও বঙ্কিমের প্রয়াসকে বাহুল্য ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করে মূর্তির তৃতীয় বেধটি অনুভব করতে পারি না। ছবি দেখার দৃষ্টি নিয়ে মূর্তিকে দেখতে গিয়ে বাস্তবতার অভাব অনুভব করি।

অথচ এই তৃতীয় বেধটি গড়ে তোলাতেই বঙ্কিমের স্বকীয় রীতি বা ষ্টাইল ধরা পড়েছে। এ ষ্টাইল বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংযোগ-নৈপুণ্যে। আমরা দেখেছি, বাস্তব উপাদান নিয়েই বঙ্কিম শিল্পের আয়োজন করেছেন। কিন্তু তাঁর কবি-কল্পনা একটা বিশেষ বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে বলে সেই পরিণামের দিকে

তাঁকে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয়েছে। বঙ্কিম ঘটনার সূচনায় ও বিকাশে একান্ত বাস্তববাদী কিন্তু ঘটনার পরিণামে তিনি কল্পনানুগামী—Didactic। পরিণামে ঘটনা তাঁর কল্পনাকেই প্রকাশ করেছে।

এর জন্যে তিনি বাস্তব ঘটনার ওপর জুলুম করেন নি, একটা অবাস্তব অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়ে দেন নি, তিনি শুধু কৌশলে ঘটনার রাশ টেনে ধরেছেন। বাস্তব ঘটনা যে বস্তুধর্মী গতি নিয়ে স্ফীত হয়ে উঠেছে, তিনি কৌশলে ভিন্ন এক ঘটনার বিপরীত আকর্ষণে সে স্ফীতি দূর করে তাকে তাঁর কল্পনার খাতে বয়ে যেতে দিয়েছেন। ফলে পরিণাম Didactic হয়েও আঙ্গিক সৌষ্ঠব হারায়নি, পরন্তু শিল্পমূর্তির এক বিশিষ্ট নিটোলতা প্রকাশ করেছে।

ঘটনার রাশ টেনে ধরায় যে ঘটনাগুলি রশির কাজ করেছে সেগুলিকে আমাদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে বুঝে দেখতে হবে। শিল্পের কোন ছাঁচের পূর্ব-সংস্কার না রেখে, এখানে শিল্পীর খাতিরেই শিল্পকে বিচার করে দেখব।

আমরা বলেছি, বঙ্কিমের বাস্তব নিষ্ঠা ঘটনাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত, কবি-কল্পনা চরিত্রকে অবলম্বন করে প্রমূর্ত। তাই পরিণামে ঘটনার রাশ টেনে ধরার কাজটি চরিত্রের মনোজীবনের অন্তর্লীন এক গভীর অধ্যায় থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলিও ঘটনা—কিন্তু তথাকথিত বাস্তব ঘটনা নয়; চরিত্রের বিশেষ এক মানসিক অবস্থা, সংস্কার এবং বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত বিচিত্র ঘটনা। চরিত্রের মানসিক অবস্থার সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত বলে শিল্পের বিচারে ঘটনাগুলি বাস্তব। আবার ভারতীয় সমাজ জীবনগত কতকগুলি ধারণা ও সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ঘটনাগুলি উপন্যাসের শিল্প-তত্ত্ব লঙ্ঘন করে নি। অর্থাৎ বিশেষ কোন সমাজ সংস্কারে সে ঘটনাগুলি জীবনের একটা বাস্তব ভূমিকাই রচনা করে দেয়।

জীবনের দ্বন্দ্বে চরিত্রগুলিকে পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বঙ্কিম শিল্পের উপকরণ হিসেবে অধুনা অপ্রচলিত কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। যেমন, স্বপ্নদর্শন; যোগসিদ্ধ কয়েকজন মহাপুরুষের প্রভাব; সিদ্ধ-পুরুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও তন্ত্রশাস্ত্র সম্মত কয়েকটি অস্বাভাবিক কার্য, যেগুলি আমাদের আধুনিক মনের কাছে সহজেই অতিলৌকিক বিষয় বলে মনে হয়, অথচ বঙ্কিমযুগে ভারতীয় সমাজে যেগুলি বাস্তবের মর্যাদা

লাভ করেছে। উপন্যাসের শিল্প-বিচারে আধুনিক বাস্তবতার মাপকাঠিতে বিষয়গুলি অবাস্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ায় এগুলিকে 'রোমান্সের আতিশয্য' বলে থাকি, জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে কোন শিল্প-গৌরব দান করি না।

শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গভীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি বঙ্কিম সাহিত্যের জটিলতম কেন্দ্র এবং দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত প্রেরণ করে বহু মূল্যবান তথ্য এবং অনাবিষ্কৃত দিক উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু এখানে অনধিকার প্রবেশ মনে করে তাঁর দৃষ্টি নিরস্ত হয়েছে। সেইজন্যে চন্দ্রশেখর উপন্যাস সম্বন্ধে শৈবলিনীর 'প্রায়শ্চিত্ত-দৃশ্য' প্রসঙ্গে তার মন্তব্যটি এইরূপ,—

"বঙ্কিম রোমান্সের বর্ণোচ্ছ্বাস গাঢ়তর করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ জগৎকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কবি আসিয়া উপন্যাসিকের হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছে। উপন্যাসক্ষেত্রে কবিত্বের এই অনধিকার প্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে ইহাও অনুভব করি। 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠে'র বাস্তব সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবীচৌধুরাণী'র অনুশীলন-তত্ত্বপ্রিয়তার অগ্রদূত।"

কিন্তু আমাদের মনে হয়, শিল্পের ঐ তথাকথিত 'অবাস্তব' উপকরণগুলি বঙ্কিম-প্রতিভায় যে বিশেষ নৈপুণ্যে বাস্তবের মর্যাদা লাভ করেছে, প্রচলিত শিল্প-সংস্কার ত্যাগ করে তা বুঝে দেখা দরকার। তা হলে আমরা দেখব যে, সেগুলির উপস্থাপনের মূলে একটি বিশেষ ধ্যান ও ধারণা রয়েছে, জীবনের দ্বন্দ্বে যাকে 'বাস্তব' করেই বঙ্কিম দেখাতে চেয়েছেন। তা নিছক রোমান্স-প্রীতি বা তত্ত্বপ্রিয়তা নয়। তখন সেগুলির শিল্পসম্মত ব্যাখ্যাও আমরা খুঁজে পাব।

৩

জীবনের দ্বন্দ্বের মূলে বঙ্কিম যেমন ঘটনার প্রাধান্য স্বীকার করেছেন তেমনি চরিত্রের মনোজীবনের পরিবর্তনের মূলে বাইরের ঘটনার চেয়ে চিত্তের কতকগুলি বিশেষ অবস্থাকে গুরুত্ব দান করেছেন। মনের সেই বিশেষ অবস্থার মূলে বাইরের ঘটনাই দায়ী কিন্তু ঘটনাগুলি সেই মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করবার পর যেন নেপথ্যে অন্তর্হিত হয়েছে এবং মনের সেই বিশেষ অবস্থায় বিবেকের দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে। এই দ্বন্দ্বে বিবেকের স্ফুরণ এবং সেই জাগ্রত বিবেকে জীবনের এক স্থায়ী পরিণামের

কথাই বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন। ঘটনা ঘটে যাবার পর সহসা চতুর্দিক নিস্তব্ধ হয়েছে, এবং সেই মৌনের মধ্যে বিবেকের গভীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গুলি নিঃশব্দে সম্পাদিত হয়েছে। উপযুক্ত উপাদান দিয়ে বঙ্কিম তাকে জীবনানুগ করে দেখিয়েছেন।

ভারতীয় চিন্তায় 'বিবেক' কথাটি ঠিক ইংরাজি conscience বলতে যা বুঝায় তা নয়। মনের যে ভাবসত্তাকে আমরা 'consciene' বলি, তা শাস্ত্রীয় বিবেকের বহিঃপ্রান্ত মাত্র। বহির্জগতের সমাজনীতি ও জীবননীতির শ্রেয়-সংস্কার জাত ভাবসত্তাকে যখন বিবেক বলি, তখন তার প্রভাবে ও অনুসরণে সামাজিক হই, শালীনতার সৌন্দর্যে সুভদ্র ব্যক্তিত্বের মহিমা প্রকাশ করি। সমাজজীবন ছাড়াও অন্তরঙ্গ জীবনচর্যার সাধনা ভারতের সংস্কৃতিতে আছে। আত্মশুদ্ধি শুধু নয়, অন্তরাত্মাশুদ্ধি এমন কি পরমাত্মায় শুদ্ধিসেবার আনন্দ ভারতের সাধনায় মেলে। এই আনন্দ অন্তর্গূঢ়, বোধে পৌঁছেও বোধাতীত। এর প্রভাবে যে ভাবসত্তার উদ্বোধন, বিবেকের আত্মপরিচয় তারই ছন্দোমহিমায়। মনোবিজ্ঞান নির্জ্ঞান মনের জগতেও বিবেকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বিবেক সেখানে Super Ego—মনের অধিশাস্তা। Conscience-এর কাজ সজ্ঞান মনে, তাই সে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন। তখন ভাল-মন্দের বিচার বোধ বিবেক আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমরা জ্ঞাতভাবেই ভাল এবং মন্দ উভয় নিয়ে দ্বন্দ্ব-মুখর হই। বঙ্কিম একে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব বলেছেন।

আমাদের মধ্যে দুই বিপরীত ইচ্ছার সংঘর্ষ হলে নানা কারণে একটি ইচ্ছা অবরুদ্ধ হয় এবং অপরটী চরিতার্থ হয়। অবরুদ্ধ ইচ্ছাটী অবদমিত হয়ে মনের নির্জ্ঞান জগতে নির্বাসিত হয় এবং নিদ্রায় মনের প্রহরী কিছুটা অসতর্ক হলে ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। তখন বিবেক জাগ্রত হয়ে ভালমন্দের বিচারবোধ নিয়ে আসে এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মনোবিজ্ঞানে এই বিবেককে Super Ego বলা হয়েছে।

Conscience এবং Super Ego ছাড়াও বিবেকের আরও গভীরতর পর্যায় ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান স্বীকার করেছেন। মনের অতীত বিজ্ঞান-চেতনা ও আনন্দ-চেতনার চতুর্থ ও পঞ্চম স্তর পর্যন্ত বিবেকের গতি। সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনকে অতিক্রম করে বিবেক তখন মনের ভেতরের মনকে প্রকাশ করে। মনের ভেতরের মন বা Supermind-এর তত্ত্ব আধুনিক মনোবিজ্ঞান স্বীকার করেন না। এই অতিমনকে তাঁরা সাধারণ মনেরই কোন একটা বিশেষ প্রকারভেদ (manifestation) বলে মনে করেন। বিশেষতঃ ব্যবহারবাদীর মতবাদে মনের

ওপর শারীরতত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়ায় মনোবিজ্ঞানেও বাস্তব উপকরণ গুলির দিকে বিশেষ সচেতনতা প্রকাশ করা হয়েছে।

দেহ, মন এবং অতিমন বা আত্মা এদের স্বরূপ-সত্য প্রসঙ্গে কোন তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের কি ধারণা ছিল, আমরা তারই পরিচয় নেব। রজনী উপন্যাসে শচীন্দ্র ও সন্ন্যাসীর কথোপকথনের মধ্যে বঙ্কিম প্রসঙ্গটী যেভাবে উত্থাপন করেছেন তাতে সন্ন্যাসীর উক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর ধারণাটী স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

শচীন্দ্র—আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক বলিয়া মানেন, কিন্তু মন একটী পৃথক, আত্মা একটী পৃথক পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই—ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি তাহাকে মানিব। যাহার কোন চিহ্ন দেখি না তাহাকে মানিব কেন?

সন্ন্যাসী—তবে বল না কেন মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব? যে কিছু কার্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য—কোনটী মনের কার্য?

শচীন্দ্র—চিন্তাপ্রবৃত্তি ভোগাদি।

সন্ন্যাসী—কিসে জানিলে সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

শচীন্দ্র—তাহাও সত্য বটে! মন শরীরের ক্রিয়ামাত্র (Function of the brain)।

সন্ন্যাসী—ভাল ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন যে শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র? শুনিয়াছি, তোমরা পঞ্চভূত মান না—তোমরা বহুভূতবাদী, তাই হউক; বল না কেন যে, ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ, শরীররূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে, কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি?

তর্কের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম এই কথাটাই বলতে চান যে, অধিকার অনুযায়ী আত্মা, মন, দেহ ইত্যাদির অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। যার মধ্যে দেহ-বুদ্ধি প্রবল, সে মন স্বীকার করতে চায় না; মন-ই যার একমাত্র বিষয়, মনের অতীত আত্মার পৃথক কোন অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। বঙ্কিম তাই বলেন:

"জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি—আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না"

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের সঙ্গে পৃথক কোন তর্ক না তুলে বঙ্কিমের ধারণার কথাই আমরা জানতে ও জানাতে চাই। জীবনের দ্বন্দ্বে বিবেকের যে স্ফূর্তির কথা বঙ্কিম বলেছেন এবং তাইতে জীবনের যে পরিণাম দেখিয়েছেন, তাতে আত্মদর্শন ও ঈশ্বরোপলব্ধির কথাও আছে। বিবেকের সামান্য অঙ্কুরেই মন শ্রেয়োভিমুখী হয়, সামঞ্জস্য ও স্থৈর্য লাভ করে। তখন সেই শান্ত মনে অধিকতর স্ফূর্তিতে জগৎকল্যাণ এবং চরমাবস্থায় ঈশ্বরধ্যানও সম্ভব।

এই বিবেকপ্রজ্ঞা যার জাগ্রত হয়নি সে একান্ত ভাবেই দেহ কিংবা মনের অধীন। কাম-কামনার সুখদুঃখে সে যেমন একান্ত অভিভূত তেমনি মানসিক বিকারগ্রস্তও বটে। 'বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি'—বাতাস যেমন জলের উপরে নৌকাকে উল্টোপথে নিয়ে যায়, সেই মনও তেমনি বিপর্যস্ত হয়। সে ক্ষেত্রে মনকে পরিমার্জিত করে বাসনাবিকারের ঊর্ধ্বে তুলতে হলে গভীর কোন প্রজ্ঞার প্রয়োজন। শাস্ত্রে একেই বিবেকপ্রজ্ঞা বলা হয়েছে। এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির স্ফুরণ মোহগ্রস্ত চঞ্চল মনে সম্ভব নয়।

বিবেকবুদ্ধি স্ফুরণের প্রত্যক্ষ ফল ইন্দ্রিয়সমূহের বশীকরণ। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞঃ তিনি 'বীতরাগভয়ক্রোধঃ'; তিনি প্রিয়লাভে উৎফুল্ল অথবা অপ্রিয়লাভে বিমর্ষ হন না। মনোবিজ্ঞানে বিকারের সংশোধনের প্রচেষ্টা আছে কিন্তু ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির কথা নেই। বাসনার উচ্ছেদের কথা নেই। যে-মন ইন্দ্রিয়ের অধীন, ইচ্ছার অধীন, এবং সে-হেতু বিপরীত ইচ্ছার সংঘর্ষে অবদমনের ফলে বিকারগ্রস্ত হয় যে-মন, মনোবিজ্ঞান তারই বিশ্লেষণে নিযুক্ত। তাই নির্জ্ঞান মনে Super Ego-র ক্রিয়াকে অনুসরণ করে মনোবিজ্ঞান বিবেকের কোন গভীরতর স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। তাই নির্জ্ঞান মনে বিবেকের দ্বন্দ্ব এবং সেই প্রসঙ্গে স্বপ্নরাজ্যের পরিচয় আধুনিক মনোবিজ্ঞন-সম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে উদ্ঘাটিত করা গেলেও বঙ্কিম সাহিত্যে বিবেকের স্বরূপোদ্ঘাটন কিছুটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। বঙ্কিম-সাহিত্যে স্বপ্নগুলির মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থেকেই আমরা দেখব যে বিবেকের ধ্যান ও ধারণা Super Ego-কে ছাড়িয়ে আরও গভীরতর কিছুর নির্দেশ দেয় এবং সেজন্যে চরিত্রও বিশেষ পরিণাম লাভ করে। জীবনের এ শিল্পায়ন বিশেষ কোন মাপকাঠিতে যদি উপন্যাসের সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে পড়ে

তবে শিল্পকে ছেঁটে না দিয়ে সংজ্ঞাটিকেই আমরা বাড়িয়ে নেব। কারণ বিশেষ সমাজজীবনে জীবনের এ রূপায়ণও বাস্তব; এবং শিল্পী যদি তকে ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাসে কার্যকারণ যোগসূত্র অটুট রেখে প্রকাশ করতে পারেন তবে জীবনানুগ কাহিনীকে সমাজানুগ রূপদানের প্রচেষ্টায় তা উপন্যাসের মর্যাদাই লাভ করবে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ তাই উপন্যাস-বিচারে প্রাসঙ্গিক। কবিত্ব বা রোমান্সের জন্যেই শুধু নয়, জীবনের বিশেষ রূপায়ণেও বঙ্কিম-সাহিত্যে স্বপ্নের অবতারণা।

তর্ক তুলতে পারি এই বলে যে, বিবেকের যে অংশটুকু সাধারণ মনের সীমার মধ্যে সেটুকু নিয়েই উপন্যাস, তার দ্বন্দ্ব আমাদের রসাস্বাদনের বিষয়। কিন্তু যে অংশটুকু মনের অতীত রাজ্যে, যার আচরণ আমাদের আয়ত্তের অতীত, তা নিয়ে উপন্যাস-শিল্প নয়।

কিন্তু আগেই বলেছি, উপন্যাসের বিচারে সমাজভেদের কথা আছে। পাশ্চাত্য সংস্কারে বিবেকের এমন কোন স্ফুরণ, যা জীবনকে বিশেষ কোন গভীর উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যায়, তার স্বীকৃতি নেই। তাই বিবেকের প্রভাবে জীবনের অচিন্তিতপূর্ব পরিবর্তন অবাস্তব ও শিল্প-বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কারে জীবনের শ্রেয়োচেতনার পরম ও চরম স্ফূর্তিতে বৈরাগ্য ও মুক্তি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ঔপনিষদিক আত্ম-চেতনা আমাদের জীবনের সকল প্রচেষ্টার মূলে গভীর ও স্থায়ী বাসা নিয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে আমরা যতই বাসনা-বিক্ষুব্ধ হই না কেন, জীবনের কোন গভীর আঘাত ও ক্ষতি আমাদের মধ্যে ঐ ঔপনিষদিক বিবেক-সংঘাতেরই সৃষ্টি করে। এই সংঘাত আত্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথে উত্তরণের সংস্কার আমাদের মধ্যে এনে দেয়।

পরিপূর্ণ মানবের আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্কিম এ ক্ষেত্রে কোন অতিমানবিক শক্তি ও তত্ত্বে আস্থা স্থাপন না করলেও শ্রেয়োধর্মের গভীরতর স্ফূর্তিতে মনুষ্যত্ব ও মানবশক্তির বলিষ্ঠতম প্রকাশ স্বীকার করেছেন। তাই আত্মানুভূতি ও বিবেক-প্রজ্ঞা বঙ্কিম চেতনায় বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা, যোগ-বল এবং তন্ত্রশক্তির বহুবিধ অলৌকিক প্রসঙ্গ কল্পকথার যে অতলান্ত মহাসাগরে ভারতবর্ষের ব্যবহারিক জীবন ও বাস্তব বুদ্ধিকে বেষ্টন করে আছে, তারই মধ্যে নিরালা দ্বীপের মতন কয়েকটি চরিত্র

বঙ্কিম স্থাপন করেছেন। সে চরিত্রগুলি ভারতীয় সমাজে একান্তই বাস্তব। কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে আজ তারা যুক্ত নয় বলে জীবনের কাহিনীতে নায়কের আসন তারা নিতে পারে না। 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিক, 'রজনী,র তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী, 'চন্দ্রশেখরে'র রমানন্দ স্বামী, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সত্যানন্দ ও অদৃশ্যচারী মহাপুরুষ, 'দেবীচৌধুরাণী'র ভবানীপাঠক, সীতারামের 'গঙ্গাধর স্বামী', বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এই মানব চরিত্রগুলি ভারতীয় জীবনে একান্তই পরিচিত।

বঙ্কিম সন্ন্যাসিতা স্বীকার করেন না, অতিপ্রাকৃতেও বিশ্বাস করেন না। অথচ জীবনের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের ফলে যে শারীরিক ও আত্মিক শক্তির স্ফুরণের কথা বলেন, এই চরিত্রগুলি যেন সেই শক্তি-সম্পদে পূর্ণ এক একটি জীবন-উৎস। জীবন থেকে এরা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও বক্তব্যের দিক থেকে এদের কাছে বঙ্কিম অনেক ঋণী। মানববাদী বঙ্কিম আধুনিক যুক্তিবাদী মন নিয়ে এদের সঙ্গে তর্কও করেছেন অথচ জীবনের গভীরতর বিকাশের প্রয়োজনে এদের দান অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার না করে পারেন নি। বঙ্কিম-সাহিত্যে এদের আবির্ভাব তাই নিছক রোমান্সপ্রীতি বা তত্ত্বমুখিতার জন্যেই নয়। জীবন-দ্বন্দ্বের বিকাশ ও পরিণামের মূলে বঙ্কিম যে বিবেকপ্রজ্ঞা স্বীকার করেন, এই চরিত্রগুলি, সম্ভবতঃ কপালকুণ্ডলার কাপালিক ছাড়া, তারই দৃষ্টান্ত স্থল। বঙ্কিমের এরা প্রতিপাদ্য নয়, কিন্তু বঙ্কিমের বিশ্বাসের এরা কেন্দ্র। এরা বঙ্কিম-চেতনায় বাস্তব ও কল্পনার সংযোগ-সেতু। এই যোগসিদ্ধ পুরুষগুলিকে ঘিরে কিছু কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনারও উদ্ভব হয়েছে। সেগুলিকে বঙ্কিম কৌশলে সন্নিবেশিত করেছেন।

এইরূপে আমরা দেখি, জীবনের পরিণামে ঘটনার রাশ টেনে ধরার জন্যে, বিবেকের দ্বন্দ্ব, সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব, এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্ভূত ও অনুষ্ঠিত কয়েকটি অস্বাভাবিক ক্রিয়া কলাপ—এইগুলির সাহায্য বঙ্কিম নিয়েছেন। এতে বাস্তব ও কল্পনার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে, উপন্যাসের বিভিন্ন অঙ্গগুলি দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়েছে, এবং জীবনটি নিটোল হয়ে উঠেছে। এই নিটোলতায় বক্তব্যের দিক থেকে বঙ্কিমকে didactic বলে অপবাদ দিলেও শিল্পের বিন্যাসে তিনি যে realist এই কথা স্মরণে রেখে, বঙ্কিম সাহিত্যের স্বপ্নগুলির বিশ্লেষণে আমরা অগ্রসর হব।

মনের সজ্ঞান রাজ্যে বিবেকের দ্বন্দ্বকে কুমতি-সুমতির দ্বন্দ্বে বঙ্কিম রূপ দিয়েছেন।

নির্জ্ঞান রাজ্যে মনের অধিশাস্তা বা Super ego-রূপে বিবেক এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। পিতার মৃত্যুর পর কুন্দের স্বপ্নের মধ্যে তার পরলোকগত মাতার প্রতীক হয়ে এই বিবেক দেখা দিয়েছে। এখানে নির্জ্ঞান মনে বিবেকের অবির্ভাবের কারণ বুঝে দেখা যাক্।

'পিতা মরিলে কুন্দের কি দশা হইবে?'—এই অসহায়তার বোধই কুন্দের স্বপ্নের কারণ। বিনিদ্ররজনীর সেবা ও ক্লান্তি বিপরীত ইচ্ছা বলে স্বপ্নে জননীর স্নেহকোমল অঙ্কের অবতারণা করেছে। কঠিন ভূমিশয্যা ছেড়ে সুখকর আশ্রয় লাভ করেছে। স্বপ্নে, কঠিনের বিপরীত কোমলের আবির্ভাব যেমন স্বাভাবিক, তেমনি, আরও কঠিন বিষয়ের স্বপ্ন দেখাও সম্ভব। দারুণ গ্রীষ্মে বরফ খাবার স্বপ্ন অথবা মরুভূমির স্বপ্ন দুই-ই দেখা সম্ভব। শৈবলিনীর স্বপ্নে যেমন কঠিন প্রস্তরশয্যা চাবুকের আঘাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পিতার মৃত্যুর পর অসহায়তার বোধ স্বপ্নে দুই বিভিন্ন প্রতীকের সৃষ্টি করেছে। প্রথমতঃ নিরাপদ আশ্রয় লাভের ইচ্ছায় পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি সবল সুদর্শন,—অনেকটা রূপকথার রাজপুত্রের মতন যার আকৃতি—স্বপ্নে দেখা স্বাভাবিক। স্বপ্নতত্ত্বে রাজপুত্র পিতার প্রতীক। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতের ভয়ভাবনা ও নিরাপত্তার অভাব সহজেই শ্যামাঙ্গী নারীর বেশ ধরে উপস্থিত হয়েছে। অথচ স্বপ্নে কোন ভয়ের ভাব কুন্দের মধ্যে নেই। সুপ্ত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশে বাধা পেলে তবে তা স্বপ্নে ভয়ের সৃষ্টি করে। এখানে কুন্দের মধ্যে তেমন কোন সুপ্ত ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে নি। অথচ বিবেক জাগ্রত হয়ে রূপবান যুবক এবং শ্যামাঙ্গী যুবতী উভয়কেই ভয় করতে বলছে। তার কারণ কি?

কিশোরীর অসহায়তার মূলে তার যৌন-সচেতনতা বিদ্যমান থাকে। পিতার অবর্তমানে কুন্দের যে অসহায়তার বোধ, তাতে তার কুমারী জীবনের নানা সম্ভাব্য কুচিন্তাই প্রবল। সেই চিন্তায় একদিকে যেমন সে যৌনজীবনের নানা বিপদ সম্বন্ধে সচেতন, তেমনি বিপরীত-ইচ্ছাবলে যৌনজীবনের নানাবিধ আকাঙ্ক্ষাও অঙ্কুরিত। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই স্বপ্নে দেখা সুকুমার যুবক একই সঙ্গে, পিতার প্রতীক এবং মোহ চরিতার্থতার পাত্র, উভয় স্থানই গ্রহণ করেছে। মোহাকাঙ্ক্ষা খুব গভীর নয় বলে এবং বিশেষ জটিল না হওয়ায় নির্জ্ঞান মনে তা কোন প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি করে নি। সেই জন্যে ভয়ের বোধও প্রবল হয়ে জাগে নি। শুধু বিবেক, নির্জ্ঞান মনে মাতৃমূর্তিতে জাগ্রত হয়ে, রূপবান যুবকের

ক্ষেত্রে মোহ বাসনা সম্বন্ধে, এবং শ্যামাঙ্গী নারীর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের নানা বিপদ আপদ সম্বন্ধে সচেতন হতে বলছে।

কুন্দের স্বপ্ন তাই পিতার মৃত্যুতে তার মানসিক অসহায়তার অবস্থা প্রকাশ করে। এখন স্বপ্নের পরদিন কোন রূপবান যুবকের সাক্ষাতে, বিশেষ সে যদি আশ্রয় দাতা হয়ে উপস্থিত হয়, তাকে স্বপ্ন-দৃষ্ট যুবকের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা খুবই সঙ্গত। মনোবিজ্ঞানে একে স্মৃত্যাভ্যাস বা Paramnesia বলে। এতে স্মৃতিবিভ্রমের ফলে যে বিষয় বা যে ঘটনার অভিজ্ঞতা একেবারে নূতন তা পূর্ব-অর্জিত বলে মনে হয়। নগেন্দ্রনাথকে কুন্দ স্বপ্নের পর যখন প্রথম দেখেছে, তখন যেমন ভাবেই হোক, সে-মূর্তি চেতনরাজ্যে স্থান পায় নি, অবচেতনায় নির্বাসিত হয়েছে। তারপর ভাল করে দেখাতে অবচেতনার মূর্তির সঙ্গে চেতন জগতের মূর্তির যে মিল ঘটেছে, তাতে তাকে পূর্বে দেখা, অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে স্বপ্নে-দেখা মূর্তি বলে ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। হীরা প্রসঙ্গেও একই কথা।

এখন, স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে আশ্রয়দাতা হিসেবে নগেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করা তার পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সেই নগেন্দ্রনাথের প্রতি আসক্ত হওয়াও তেমনি মনস্তত্ত্ব সম্মত। কুন্দের স্বপ্নের মধ্যেই এই আসক্তির ব্যাখ্যা রয়েছে। কৈশোরের উন্মেষে কুন্দ আপনারও অগোচরে নগেন্দ্রনাথের প্রতি গোপনে আসক্ত হয়েছিল। অজ্ঞাতকুলশীলের প্রতি কুন্দের মৃত জননীর উপদেশ অবচেতনায় কুন্দেরই অস্ফুট বিবেকের সতর্কবাণী। কুন্দের এই গোপন প্রণয়ের কথা বঙ্কিম উপন্যাসের শেষ অংশে উল্লেখ করেছেন।—"বিবাহের অগ্রে বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই কেহ জানিতে পারে নাই।"

কাহিনীর শেষে একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তিতে ভীতিপ্রদ পূর্বাবস্থা পুনরায় উপস্থিত হয়েছে। ফ্রয়েড একে বলেছেন repetition compulsion বা অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তি। এতে ব্যক্তি একই ভয়প্রদ স্বপ্নের বারবার সম্মুখীন হয়। এখানে কুন্দ এই স্বপ্নে বিবেকের পথ-নির্দেশে মৃত্যুকেই বরণ করেছে। বলা বাহুল্য, কোন উচ্চে তন মনের জগতে বিবেকের স্ফুরণ হয় নি, ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বে মৃত্যুর মধ্যে নিষ্কৃতি পাবার আর্ততাই এখানে প্রবল।

সন্ন্যাসীর তন্ত্রবিদ্যা প্রভাবে শচীন্দ্রের রজনীকে স্বপ্ন দেখার মধ্যেও তার মনোজীবনের একটি সহজ পরিচয় বঙ্কিম উপস্থিত করেছেন।

"স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কলকল গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে সৈকতভূমি। তাহার প্রান্ত-ভাগে অর্ধজলমগ্না—কে ?—রজনী !

রজনীর প্রতি শচীন্দ্র যে গোপনে আসক্ত, রজনীর রূপ-বর্ণনায়, এবং রজনীর অন্তর্ধানে তার শুভাশুভ চিন্তার উদ্বেগে, স্পষ্টই অনুভব করা যায়। কিন্তু পরি-বেশের দিক থেকে রজনীকে লাভ করার সজ্ঞান বাসনানুভবে অনেক বাধা। তাই সেই প্রবল ইচ্ছাটিকে নানা কৈফিয়তে সরিয়ে রাখার চেষ্টা দেখতে পাই—"রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ ; রজনী পুষ্প-বিক্রেতার কন্যা ; এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না ; ইচ্ছাও নাই।

কাজেই ইচ্ছাটি অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত হয়েছে। তখন ইচ্ছা-যুগ্মের তত্ত্ব অনুযায়ী, রজনী তাকে মর্মান্তিক ভালবাসুক, মনের প্রহরীর অসতর্ক মুহূর্তে এ ইচ্ছাও মনে জাগা স্বাভাবিক। সন্ন্যাসীর suggestion এ মনের প্রহরী বিবেকের দ্বারা কিছুটা প্রবঞ্চিত হয়েছে ; অর্থাৎ, 'আমি তো নিজে থেকে ভাবিনি, সন্ন্যাসী বলেছে, তাই ভাবছি', এমন একটা অজুহাত সৃষ্টি হয়েছে। তখন অন্ধের পক্ষে যে পরিবেশ নিতান্ত দুর্যোগপূর্ণ তারই মধ্যে রজনীকে স্থাপন করে অবদমিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা প্রকাশ-পথ খুঁজেছে। এখন' স্বপ্নের গঙ্গার সঙ্গে বাস্তব গঙ্গার যে ঘটনাগত মিল, সেটুকু বঙ্কিমের কল্পনার কেরামতি।

কুন্দ এবং শচীন্দ্র উভয়ের স্বপ্নের মধ্যেই প্রতীকের বিশেষ জটিলতা নেই। শচীন্দ্রের ক্ষেত্রে বিবেকের দ্বন্দ্বও খুব জটিল নয়। অন্ধনারীর প্রতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয়ে অবচেতনায় বাসা বেঁধেছে। পরিবেশের নানা বিরোধিতায় তা প্রবল মনোবিকারে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, রজনী-লাভই এহেন বায়ুরোগের একমাত্র দাওয়াই।

এখানে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে বিবেকের কাজ হল মোহকে একনিষ্ঠ প্রেমে রূপান্তরিত করা। সজ্ঞানে এ রূপান্তর সম্ভব হত না। সামাজিক নানা বাধা, বিশেষ রজনীর 'ফুলওয়ালী'র পরিচয়, শিক্ষিত উচ্চবংশমর্যাদা সম্পন্ন শচীন্দ্রের প্রণয়ের সুর স্বাভাবিক ভাবেই নামিয়ে আনত। ওই শ্রেণীর রূপসী যুবতীর প্রতি ধনীযুবকের স্থূল লালসা যে গ্লানিকর অধ্যায় রচনা করে, সজ্ঞানে মোহ প্রবল হলে তেমন কোন অধ্যায় এ ক্ষেত্রেও পরিণামে দেখা দিত।

কিন্তু নির্জ্ঞান মনে বিবেকের দ্বন্দ্বে দুই বিপরীত ইচ্ছার সংঘর্ষে মোহের উদ্গাম (sublimation) হয়েছে। অন্ধ পুষ্পনারী হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে স্থাপিত হয়ে বেদনার অর্ঘ লাভ করেছে। ইতিমধ্যে কল্পকথার মত রজনীর সামাজিক

পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে উপন্যাস একটি সার্থক মিলনাত্মক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এই মিলনের মধ্য দিয়ে সমাজের দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের দুটি নর-নারীকে একত্র করে বঙ্কিম এরূপ মিলনের সামাজিক সমর্থন রচনা করেছেন। শচীন্দ্রের চিত্তদাহের দৃশ্যটি তাই এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক।

শৈবলিনীর অন্তর্দাহ ও তার মনোবিপ্লবের বিস্তারিত দৃশ্যগুলির অন্তরালে অন্যপূর্বা রমণীর পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের সামাজিক সমর্থন রচনার প্রয়াস লুকিয়ে আছে। আমাদের কাছে তা 'প্রায়শ্চিত্তের' দৃশ্য বলে কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সত্যকার সামাজিক কোন 'প্রায়শ্চিত্ত' উপন্যাসের মধ্যে নেই বঙ্কিমও তা অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তোলেন নি। অন্তর্দাহের অধ্যায়টি মনস্তাত্ত্বিক কারণেই শৈবলিনীর জীবনে উপস্থিত হয়েছে, তাকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলে আজ আমরা তা মূল্যহীন বলে মনে করতে পারি, কিন্তু মনো-জীবনের রূপভেদ ও রূপান্তরের তত্ত্ব যাঁরা বোঝেন—তাঁরা এর মধ্যে সর্বজনীন জীবনসত্তা এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত তাৎপর্যের সৌন্দর্যই আস্বাদ করবেন।

শৈবলিনীর স্বপ্নের মধ্যেও বিশেষ জটিলতা নেই, প্রতীকগুলিও খুব ছদ্মবেশী নয়। দুই বিপরীত ইচ্ছার সংঘর্ষ এবং তারই একটির অবদমন স্বাভাবিক ভাবেই স্বপ্নে বিভিন্ন রূপ-কল্পের সৃষ্টি করেছে।

চন্দ্রশেখরের প্রজ্ঞাবান চরিত্রের সংযমে শৈবলিনীর ক্ষুধা কিছুটা অপরিতৃপ্ত। অথচ চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্ব তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। অচরিতার্থ ক্ষুধা যেমন চরিতার্থতার ভিন্ন পথ খুঁজেছে এবং সজ্ঞানেই পূর্ব-প্রণয়ীর দিকে ধাবিত হয়েছে, তেমনি চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্বের ধীর ও অনিবার্য আকর্ষণও অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে বাসা বেঁধেছে। প্রতাপের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে শৈবলিনীর ক্ষুধা যখন নিরাশ্রয়ী, তখন অবচেতনায় নির্বাসিত চন্দ্রশেখরের প্রতি প্রেম,—মনোবিজ্ঞানীর ভাষায়,—স্নেহ-শান্তি-নির্ভরতায় সমৃদ্ধ একটি আশ্রয় পাবার ইচ্ছা, যার পারিভাষিক নাম 'বাঁচবার ইচ্ছা' তা স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল হয়ে উঠে শৈবলিনীকে বেদ-গ্রামের নিভৃত কুটিরের স্মৃতিতে উদভ্রান্ত করে তুলবে। তখন সেই নিরাশ্রয়ী তৃষ্ণার মোড় ঘোরানোর কাজটি বঙ্কিম সুকৌশলে রমানন্দ স্বামীর 'স্বামী' মন্ত্রের suggestionএ সম্পন্ন করেছেন। নূতন করে বাঁচবার ইচ্ছায় চন্দ্রশেখরের চরিত্র-মাধুর্য তার মনের মধ্যে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে।

শৈবলিনীর মধ্যে কামেচ্ছার সঙ্গে বাঁচবার ইচ্ছাও সমধিক প্রবল। এই দুই ইচ্ছার সংঘর্ষ শৈবলিনীর কৈশোর প্রণয়কে বিপর্যস্ত করেছে। এই ইচ্ছা প্রবল হয়ে

উঠে প্রতাপের কাছ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে মনস্তাত্ত্বিক নিয়মে এরই বিপরীত ইচ্ছা,—মৃত্যু ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে, অচরিতার্থ কামতৃষ্ণার সঙ্গে মিলিত হয়ে, বাঁচবার ইচ্ছাকে, তথা চন্দ্রশেখরের প্রতি শৈবলিনীর প্রেমকে, অবদমিত করে সক্রিয় বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নানা দুর্যোগ ও বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে সেই মৃত্যু-ইচ্ছা কিছুটা চরিতার্থ হওয়ায় শৈবলিনীর মনে যেমন বাঁচবার ইচ্ছা পুনরায় প্রবল হয়েছে, তেমনি তার কামেচ্ছা প্রতাপের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই চন্দ্রশেখরের দিকে পুনরায় ধাবিত হয়েছে। এই উভয়ের সংযোগে শৈবলিনীর মানস-পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। চন্দ্রশেখরের স্মৃতিমুখর বেদগ্রামের নিভৃত কুটীর মনে পড়েছে।

শৈবলিনীর স্বপ্ন-দৃশ্যগুলি সমস্তই, মরবার ইচ্ছা ও বাঁচবার ইচ্ছা এই দুই বিপরীত ইচ্ছার সংঘর্ষজনিত বিভিন্ন জীবন চিত্র, বলতে পারেন রূপকচিত্র। পথ-শ্রান্তির শারীরিক যন্ত্রণাগুলি স্বপ্নে নরক-দর্শনের যন্ত্রণায় স্বাভাবিক ভাবেই রূপান্তরিত হয়েছে। বাঁচবার ইচ্ছা যখন পুনরায় প্রবল হয়েছে তখন স্বামীর ধ্যানে তাকে চিরস্থায়ী করা হয়েছে।

"—যে বলেছিল, এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চির-প্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

স্বামীর ধ্যানে তাই শৈবলিনীর বিবেক জাগ্রত হল, দিব্য চক্ষু লাভ হল। সেই বিবেকের দৃষ্টিতে—

"অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্যচক্ষু চহিয়া শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা!.........কে আমি - তাঁহার কি যোগ্য? বালিকা, অজ্ঞান—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে?...মরিলাম না কেন?"

জাগ্রত বিবেকের এই অভিনব নাটক-ই বঙ্কিমের এখানে বক্তব্য। মনের ভিতরের এই মন বাসনা কামনার নানা স্থূলতার মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে। শ্রেয়কে

সুন্দরকে সত্যকে জীবনে স্বীকার করা সম্ভব হয় না। মোহের বিকারে তাই বিপর্যস্ত হই। বিবেক আচ্ছন্ন হয়। চিত্তের বিকাশ হয় না, ভক্তির উদয় হয় না, জীবন থাকে সামঞ্জস্য হীন।

শৈবলিনীর জীবনে প্রতাপ যে মোহাবরণের সৃষ্টি করেছে, বিবেকের স্ফুরণে সেই আবরণ ছিন্ন হয়েছে। চন্দ্রশেখরের চন্দ্রিকায় সে অভিস্নাত হয়েছে। বিবেকের এই স্ফুরণের জন্যেই স্বপ্নের অবতারণা। শৈবলিনীর জীবনদ্বন্দ্বে এ যেমন অনিবার্য, মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় তেমনি যুক্তি সম্মত। ঘটনাধারার সঙ্গে এবং চরিত্রের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত বলে এ উপন্যাস শিল্প-সম্মতও বটে। বঙ্কিম তাই এখানে ঔপন্যাসিকের অধিকার কোন মতেই লঙ্ঘন করেন নি, পরন্তু মনো-জীবনের দ্বন্দ্বের এক অভিনব চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে এ দৃশ্য তুলনা রহিত, এবং বঙ্কিম প্রতিভাতেই এ শিল্পায়ন সম্ভব।

বিবেকের এই স্ফুরণেই বঙ্কিমের চরিত্রগুলি নিটোল হয়েছে, তৃতীয় বেধটি লাভ করেছে। এক বিশেষ শিল্পরীতিতে ঘটনার রাশ টেনে ধরে বঙ্কিম পরিণামের দিকে কাহিনীকে নিয়ে গিয়েছেন। নানা ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে বিবেকবুদ্ধিই সর্বত্র জাগ্রত। এতে বিষয় ও অধিকার অনুযায়ী কেউ বা সংসারের মধ্যে আবার কেউ বা সংসারের প্রান্তে নীত হয়েছে। বিবেক যেখানে নির্জ্ঞানমনের জগৎকে অতিক্রম করে কোন অতিমনকে স্পর্শ করেছে, সেখানে মানস-চিত্র অনুপস্থিত, শুধু তার ফলটা দেখতে পাই। গোবিন্দলালের সন্ন্যাস, অমরনাথের ঈশ্বরে নির্ভরতা, সীতারামের আত্মসম্বিৎ লাভ এবং ভাগবত চেতনায় অধিষ্ঠান, এমনই কয়েকটি পরিণাম। ভারতীয় সংস্কারে এ জীবনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বলেই উপন্যাসের মর্যাদা এতে লাঘব হয় না।

বিবেকের দ্বন্দ্ব অনুসরণ করে আমরা দেখি জীবনের সংঘাতে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা যেমনই হোক না কেন, পরিণামে সামঞ্জস্য বিধানেরই কথা রয়েছে। বাইরের ক্ষতি অতিক্রম করে অন্তরের সেই প্রাপ্তিই বড় হয়ে উঠেছে। সেই প্রাপ্তিতে ক্ষতির ক্ষতগুলি ঢাকা পড়েছে বলেই রীতির দিক থেকে পাশ্চাত্য ট্রাজেডিকে অনুসরণ করলেও পরিণামে ট্রাজেডির ফলশ্রুতি নেই। লোকায়ত দৃষ্টিতে যা ট্রাজেডি, লোকোত্তর বিবেকবেদনায় তা শান্তি-চেতনার অপর নাম। এই শান্তি-চেতনার মহত্ত্বটি মনে রেখে বঙ্কিমকল্পিত সামঞ্জস্যতত্ত্বের পুনর্বিচার প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজচেতনা

উপন্যাস হল সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনের ছবি। সমাজ-জীবন ব্যক্তিচেতনার বাস্তব আশ্রয়। বাঙলা-সাহিত্যের যিনি প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক, তাঁর সাহিত্যে বাঙলার সমাজ-জীবনের একটা স্পষ্ট পরিচয় তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়ে।

কিন্তু বঙ্কিমের সমাজ চেতনার পরিচয় নিতে গিয়ে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। আমাদের বর্তমান সমাজ বঙ্কিম যুগ থেকে এত বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে যে, আজকের সমস্যার দিকে তাকিয়ে, বঙ্কিমের অনেক চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। আজকের জীবন-বিক্ষোভের কোন কোন বীজ হয়তো তখন উপ্ত হয়েছিল, আজকের সমস্যার কোন দূরতম কারণ হয়তো তখনই অঙ্কুরিত হয়েছিল, তবু যে বিপুল বিস্তার ও বিচিত্রতা নিয়ে আমাদের জীবন আজ এগিয়ে চলেছে, বঙ্কিম-যুগের সঙ্গে তার প্রতিটি তরঙ্গের অনবচ্ছিন্ন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া নিতান্তই দুরূহ বিষয়। সমাজ মানসের সে ইতিহাস উদ্ঘাটন আমাদের জিজ্ঞাসা নয়। আমরা জানতে চাই, বঙ্কিম-চেতনায় সমাজ-জীবন কি সংহত রূপ নিয়েছে। সমাজ-জীবনের সেই সংহত রূপটি তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই দিয়েই তাঁর শিল্পের বিশিষ্ট জগৎটি গড়ে উঠেছে। এ জগৎ সে যুগের সমাজ-জীবনের ঠিক ফটোগ্রাফী নয়; 'আলালের ঘরের দুলাল' 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সায়' যে সমাজ-পরিচিতি পাই তা-ও নয়—বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কতকগুলি অবস্থা পরম্পরার রিপোর্ট নয়, তা বঙ্কিম-বেদনায় জাগ্রত এবং ধ্যানে সংহত ভালো-মন্দে-মেশা জীবনের একটি সত্য ছবি। তার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি ঐক্যও আছে। সেই ঐক্যের আদর্শকে আজ হয়তো আমরা স্বীকার করতে চাই না। আমাদের বস্তুগত সমস্যার সঙ্গে বঙ্কিমের কল্পনার মিল খুঁজে পাই না। আজকের সমাজ জীবনের সংগঠনে নানা বস্তুগত চাহিদার শ্লোগানকে আমরা বাস্তব জেনেই শ্রদ্ধা করি, কোন প্রশ্ন করি না! কিন্তু সেই বাস্তব অবিশ্রান্ত চাহিদা সৃষ্টি

করে যে এক বিশেষ চাহিদার দিকে গোপনে গুঁড়িমেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি দেশ ও জাতির কাঠগড়ায় দাঁড় করাই তবে সে মুহূর্ত্তে দেশের মাটি ছেড়ে অসম্ভবের আকাশে স্পর্ধিত হাউই-এর মত উধাও হয়ে যাবে।

তবু সেই চাহিদার হাউইটাকেই আমরা খাতির করি, যেহেতু আজকের বস্তু-সমস্যার সঙ্গে তার আপোষ—আমাদের রুটির উপরেই তার বারুদের প্রাসাদ।

সেই বারুদের প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমের ধ্যানের আশ্রমখানি, মাতৃ-পূজার অশ্রুসজল আয়োজনখানি, বেদনার বিলীয়মান গীতমূর্চ্ছনাটি, সাম্প্রতিকদের বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল মনের উদ্ভট খেয়াল বা আত্মরতি ছাড়া যেন আর কিছু না!

অন্নের চাহিদার সামনে দাঁড়িয়ে সেই উদ্ভটের ছদ্মবেশ নিয়েই প্রবীণ মনীষী বললেন ঃ

—তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই ; নইলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়ীতে কাজ নাই, গর্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্তের এক কোণ খালি থাকে, সে-ও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী ; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটি বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

'সকল বেকল হইয়া যাইবে'—আজকের বাহ্যসম্পদের এবং নিত্য চাহিদার অবিরাম সংঘর্ষের মধ্যে এই কথাটাই কি উঁকি মারছে না? যখন শ্লোগানের জোরে যাকে আজ গদীতে বসাচ্ছি, তাকেই মৃত্যুর পর ফাঁসীতে লটকাচ্ছি ; অন্নের চাহিদার সমর্থনে বিশ্বশান্তির ছলনা করছি, আবার সুযোগ পেলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে উদরসাৎ করবার চেষ্টা করছি ; পরস্পরকে সন্দেহ করছি, অবিশ্বাস করছি, ভয় করছি, পরহিতের বুলি আউরে আত্মহিত চরিতার্থ করছি, তখন এই কথাই কি প্রমাণ করছি না—সকলই বেকল হইয়া যাইবে?

যদি বলেন, না,—যদি বেশী বুদ্ধিমত্তার ছাড়পত্র দাখিল করেন, ভাবেন, আপনার চিন্তার ভাষা ও ভঙ্গীটাই ঠিক ; আপনি অর্থনীতি, সমাজনীতি,

ইতিহাস এবং নৃ-তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে মোহহীন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন এবং তাইতে প্রচলিত সর্ববিধ সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে জাতি ও সমাজ-বহির্ভূত এক বিশ্ব-জীবনগত নাগরিকতা লাভ করেছেন, তখন বলাবাহুল্য, বঙ্কিম তাঁর বিশেষ সমাজ চেতনা নিয়ে আপনার সঙ্গে কলহ করবেন না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেন :

"যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না।"

জীবনের এই 'Fundamental Value Sense' মনে হয়, আপনিও স্বীকার করেন। তবে বঙ্কিমের সঙ্গে আমরা কলহ করি কেন ? তার কারণ মানব-মঙ্গলের পথকে বিপ্লবের পথ বলে বঙ্কিম মেনে নেন নি। বিপ্লবের পথের কথা বঙ্কিম জানতেন ; সেই মারামারি, কাড়াকাড়ি, হানাহানির পথরেখা মানবের চলার পথে নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তাতে স্থায়ী মঙ্গল আসে নি, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। বঙ্কিম তাই কিছুতেই তাকে পরম বলে মানেন না।

কলহের কথা থাক। বঙ্কিম যদি আজকের সমাজে না চলেন, তাঁকে চালাবার অধিকার আমরা নিয়ে আসি নি। কারণ বঙ্কিমের সে প্রজ্ঞা আমাদের নেই, সে প্রেম আমাদের নেই, সে বেদনা-বোধ আমাদের নেই। আমাদের বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা এই জন্যে যে, আজকের নানা সাম্প্রতিক সমস্যা দেশের রসিক-মনকে বঙ্কিমের শিল্প সম্বন্ধে অসাড় ও উদাসীন করে দিচ্ছে ; বঙ্কিম সম্বন্ধে সেই ক্ষতি নিবারণের প্রয়াসই আমাদের সাধনা। আমরা তাই দেখতে চাই জীবনের Value Sense বঙ্কিমের কি ছিল, এবং তাঁর সমাজ-চেতনায় তা কি সংহত রূপ ধারণ করল। তা বুঝলে, ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্বকে বঙ্কিম কি শিল্পরূপ দান করলেন তা জানার আগ্রহ হবে।

নববাবুবিলাস 'আলালের ঘরের দুলাল' কি হুতোম প্যাঁচার নক্সায় নব্যবঙ্গের যে সমাজ আমরা দেখেছি, বঙ্কিম তারই মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের নির্দেশ দিলেন। শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর লক্ষ্য। শিল্পের জগৎ হিসেবে এটাই তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ বলে শিল্পের উপকরণ তিনি এখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের জগৎ তাঁর শিল্পের প্রেরণার মধ্যে ধরা দেয় নি। তার কারণ এই নয় যে, অভিজ্ঞতার অভাব। এ কথা অবশ্যই যথার্থ, জীবনের সঙ্গে যুক্ত না হলে কল্পনা শুধু 'কৃত্রিম পণ্যই'

রচনা করে, 'সৌখীন মজদুরী' প্রকাশ করে। সে খেলনা তৈরী করতে বঙ্কিম নিশ্চয় চান নি। তবু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শোষণ জমিদার সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচার, তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। সামাজিক নানাবিধ অসাম্যের সমস্যা তাঁর কাছেই বোধ করি তৎকালে প্রবলতম হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের দুর্দশার মূলে এই সামাজিক বৈষম্যের আধিক্য তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু সমাধানের প্রসঙ্গে রাতারাতি কোন স্বপ্নসিদ্ধির আকাশ কুসুম কল্পনা করেননি। দেশের যুবশক্তির পক্ষে তখন যে পথটুকু পায়ে হেঁটে চলা সম্ভব, সে পথটুকু বঙ্কিম জীবনের বাস্তব-সাধনার মধ্যে দিয়েই কেটে দিয়েছেন। বঙ্কিম একথা স্পষ্ট বুঝেছিলেন, দেশের যদি স্থায়ী মঙ্গল আনতে হয় তবে তা 'পরাণ-মণ্ডল'—'তোরাবে'র হাত দিয়ে বিপ্লবের পথে নয়, নব্যবঙ্গের জাগ্রত যুবশক্তির হাত দিয়েই—চরিত্র সাধনার পথে।

আধ্যাত্মিকতা-বিবর্জিত 'হিউম্যানিজম্'-এর ধারণা বঙ্কিমের নয়। বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন না যে, অন্তরে ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং জিঘাংসা-বৃত্তি নিয়ে মানবসমাজের কল্যাণ করা যায়। কোন বস্তুতান্ত্রিক চাহিদা বিশ্বমানবতার কল্যাণকামিতায় আমাদের জাগ্রত করতে পারে না, যদি না সেই সঙ্গে অন্তরে অন্যতর দীক্ষা ও প্রার্থনা থাকে। সেই প্রার্থনাই বঙ্কিমের সকল উদ্যমের নন্দীপাঠ। সমাজের সংস্কারের মূলে ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি তাই নিতান্তই প্রয়োজন বলে তিনি বুঝেছিলেন। তিনি বলেন, চিত্তশুদ্ধিই মানব-প্রীতি হয়ে সমাজসেবায় প্রকাশ পায়। সমাজ সংগঠনের মূলে তাই আগে চাই আত্মসংগঠন, তথা প্রেমদীক্ষা। ব্যক্তিতে যা প্রেম, সমাজে তাই ধর্ম।

—"প্রেম এবং ধর্ম একই পদার্থ। সর্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম যতদিন না সার্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"—['ভালবাসার অত্যাচার'—বিবিধ প্রবন্ধ]

'পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।' ব্যক্তির কাছে সমাজের জন্যে এর চেয়ে বড় দাবী বঙ্কিমের আর নেই। প্রেমের চরিত্র আগে অর্জন কর, তারপর সেই প্রেম প্রীতিতে বিকশিত কর। প্রেম যদি ফুল, প্রীতি তবে ফল। প্রেম ব্যক্তিকে নিয়ে, প্রীতি বিশ্বকে নিয়ে। এই প্রীতি বঙ্কিমকল্পিত মনুষ্যত্ববোধের জননী—সমাজ চেতনা যার সাম্প্রতিক নাম।

ব্যক্তি প্রসঙ্গে যেমন, সমাজ প্রসঙ্গেও তেমনি, বঙ্কিম একেবারে ভেতর থেকে শোধনের কথা বললেন। আধুনিক সমাজবিদ্‌দের মতন পাশ্চাত্যের কাছে

শূন্য ঝুলি না পেতে, জাতিরই অন্তরে সমাজশক্তির যে গোপন উৎস আছে তাকে আবিষ্কার করলেন। পাশ্চাত্ত্যের জীবনবেগ দিয়ে সে উৎসমুখের বহুদিনের জড় পাষাণ বাধাগুলি দূর করলেন। বললেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে।" ['স্বদেশপ্রীতি'—ধর্মতত্ত্ব]

সেই প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বজাত্যবোধের উচিতমাত্রায় সমর্থন করলেন, তেমনি চিত্তশুদ্ধির গুরুত্বও স্বীকার করলেন। বললেন, চিত্তশুদ্ধিরই ফল হল হৃদয়ে শান্তি, মনুষ্যে প্রীতি, ঈশ্বরে ভক্তি। এই চিত্তশুদ্ধিই হিন্দুধর্মের সার।—"যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।"['চিত্তশুদ্ধি'—বিবিধ প্রবন্ধ]

পাশ্চাত্ত্য সমাজবিদ্‌দের বহুবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তাশীল রচনার মধ্যে এই 'চিত্তশুদ্ধি'রই অনুসন্ধান করেছেন বঙ্কিম। বলাবাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কতকগুলি আধুনিক ভাষা ও ভঙ্গী পেয়েছেন মাত্র, সারবস্তু অনুপস্থিত। নব্যবঙ্গের যুবকদের জন্যে সে ভাষা অবশ্য তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ধর্মের নানা সংজ্ঞা তাই পাশ্চাত্যের কাছ থেকে গ্রহণ করলেন কিন্তু 'চিত্তশুদ্ধি'র ধ্বনিটি যেখানে নেই, তাকে অন্তর দিয়ে মানতে চাইলেন না। তাই কাণ্টের 'Religion is Morality; স্লিয়ের মেকরের—"Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something which though it determines us, we cannot determine in our turn; হেগেলের—"Religion is perfect freedom; for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit;" এবং ম্যাক্স মূলারের—"Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite"; —এ পর্যন্ত যা কিছু চিন্তা, তা বঙ্কিম এক রকম পাশ কাটিয়েই গেছেন। তবে মিলের নীতিবাদের মধ্যে একটু উৎসাহ পেয়েছেন। যেমন —The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfull paramount over all selfish objects of desire."

'Emotion' এবং 'Desire' এর সংস্কারের কথা এখানে উঁকি মারছে, তাই বুঝি বঙ্কিম মিলের ভক্ত। সীলীর কথাটির মধ্যেও এই ধ্বনি বঙ্কিম পেয়েছেন—Without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be dcseribed as ha'.itual and permanent admiration." সীলীর ভাষায় কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গীটাই মুখ্য, ভারতীয় সংস্কার এইটুকুতে খুশি হয় না। তার চেয়ে বঙ্কিমের কাছে নিরীশ্বরবাদী কোম্‌ৎ আরও স্পষ্ট এবং গভীর। কোম্‌ৎ বলেন,—' Religion consists in regulating one's individual nature and forms the rallying-point for all the separate individuals."

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য মনীষা সমাজ-বিজ্ঞানে কেন যে একটা আধ্যাত্মিক ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে, তার কারণ বিংশ শতাব্দীর দুই মহাযুদ্ধের অগ্ন্যুৎপাতেই বুঝতে পারা যায়। বিজ্ঞান তাদের ব্যাহ্য সম্পদ দিয়েছে, তাই সেই সঙ্গে দিয়েছে, প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, আর হানাহানি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাৎ। সেই অভিসম্পাত থেকে বাঁচবার জন্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সমাজবিদ্ মনীষীরা মুক্তির উপায় গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন। অথচ বস্তুতৃষ্ণার যে বৈরাগ্য-সাধনা এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবার উপায় তাকে ইউরোপ কিছুতেই স্বীকার করছিল না। পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কথা শোনবার ধৈর্য যখন তাদের হল, এবং ভারতবর্ষের সেই আসনটি ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব-সাধকেরা (যাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম) তৈরী করে দিলেন, তখন উপনিষদের বাণী থেকে সমন্বয়ের একটা সূত্র তাঁরা পেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ চেতনায় সেই বাণীরই যে পূর্ব-প্রস্তুতি আছে এ কথা আমরা বিশেষ অভিমানের সঙ্গে স্বীকার করব। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-সমাজের এক গভীর সমস্যা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিতে গীতার নূতন ভাষ্যে যে অস্ফুট সমাধান খুঁজে পেয়েছিল, তাকে ভাষা ও ভঙ্গীর দিক থেকে সেকেলে মনে করে আমরা আজ তার প্রতি উদাসীন হতে পারি, কিন্তু সেই সমাধানই বিশ্বকবির কণ্ঠে উচ্চকিত রবে ঘোষিত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সর্ববিধ দম্ভকে উপহাস করে সূর্য-দীপ্তিতে বিশ্বকে উদ্ভাসিত করেছে,—এ কথা ঐতিহাসিক সত্য।

সেই ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, বঙ্কিমের সমাজ-চেতনা গতিহীন প্রতিক্রিয়াশাল জীবন-জিজ্ঞাসা নয় ; পাশ্চাত্য সমাজবিদ্‌দের চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের

মৌল রহস্য তিনি বৃথাই অনুসন্ধান করে বেড়ান নি। তাঁর চিন্তার মধ্যে মহাকালের একটি সুনিশ্চিত পদক্ষেপ স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে যে বিশ্বসমাজ-চেতনার অভিমুখে ভারতীয় চিন্তাধারা অগ্রসর হয়েছে, বঙ্কিমের মধ্যে তারই সূচনা। বিশ্বসমাজমানসের পরিপ্রেক্ষিতে কবিগুরুর শ্রেয়োসাধনার আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতিও চিত্ত শুদ্ধিরই স্বাভাবিক বিকাশ।

ব্যক্তি, সমাজ ও ঈশ্বর, বঙ্কিমের ধ্যানে একই অধ্যাত্মচেতনায় সমন্বিত ও সম্পর্কিত হয়েছে। হৃদয়ে শান্তি, মনুষ্যে প্রীতি, ঈশ্বরে ভক্তি, একই চিত্তশুদ্ধির ফল। কোম্‌ৎ-এর চিন্তায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ তত্ত্বটি স্পষ্ট, গভীর এবং কল্যাণবুদ্ধি-প্রসূত বলে বঙ্কিম তাকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে যে 'One common purpose' এর কথা আছে, তাতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। বঙ্কিম কিন্তু 'regulating one's individual nature' এই কথাটি ধরে পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শে, তথা ঈশ্বরে উপনীত হয়েছেন। বস্তুত, এই ভাগবৎ চেতনা না হলে সমাজ চেতনাও গভীর ও সার্থক হয় না। সমাজ চেতনায় যখন এই পরিপূর্ণ মানবের প্রতি অন্তরের গভীর ভক্তি প্রতিফলিত হয়, তখনই সমাজ-সংগঠনে এবং সমস্যা-সমাধানে, সীমিত স্বার্থকে অতিক্রম করে বিশ্বজীবনগত চিরন্তন সত্যের সাধনা করতে পারি। স্বার্থবুদ্ধি, তথা অভিসন্ধি প্রবল হলে বিশ্বজীবনগত সত্য থেকে সরে আসি। তখন দেশগত বা রাষ্ট্রগত বিশেষ কোন স্বার্থ-সিদ্ধিই মুখ্য করে তুলি। তখন সকলের কল্যাণের কথা ভুলে নিজের দেশ বা রাষ্ট্রের কল্যাণটাই বড় হয়ে ওঠে। তখন সমাজ সংগঠনে প্রেমের চেয়ে 'পলিসি' বড় হয়। 'পলিসি'-পরিকল্পনায় আছে সাম্প্রতিকতা। কিন্তু প্রীতির দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তসাধনায় আছে চিরন্তন সত্যের মহিমা। 'পলিসি'—সাময়িক সমাধান ; তাই তাকে বারবার বদলাতে হয়, কেন না মূলে স্বার্থবুদ্ধির ব্যাধি থাকায় সমস্যা বারবার বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয়। কিন্তু প্রীতি স্বার্থবুদ্ধির অতীত—বিশ্বজীবনগত মানব-মঙ্গলের চিরন্তন রূপই তার সাধনা।

প্রীতি তাই সমাজ চেতনার মূল,—ভাগবত চেতনারই তা অপর নাম।

বঙ্কিম ধর্মকে তথা ঈশ্বরকে জীবনের সঙ্গে কতখানি গভীভাবে যুক্ত করে দেখেছেন, এবং সেইজন্যে সমাজচেতনায় ঈশ্বর প্রসঙ্গ ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে আছে। বঙ্কিমের চিন্তার এই কেন্দ্রটির দিকে দৃষ্টি না রাখলে তাঁর সমাজচেতনার যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হবে না, পাশ্চাত্য মনীষার কাছে তাঁকে নিতান্ত অধমর্ণ জেনেই হয়তো নিরস্ত হব।

সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্যে বঙ্কিম আধ্যাত্মিক চেতনার কথাই বলেছেন। জীবনের অধ্যাত্মিকা বলতে আমরা অনেক সময় বাস্তব বিবর্জিত ভাবনা বুঝি। কিন্তু আধ্যাত্মিকা অর্থে বাস্তব বিরুদ্ধতা নয়। বাস্তব বুদ্ধিও আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে আসতে পারে। অধি-আত্মিকতা, অর্থাৎ জীবনের অন্তরস্থ কিছু। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অধিজীবন বা inner life আছে। যা কিছু আমরা করি, ভাল বা মন্দ, তা এই আধজীবনের নির্দেশ। আমাদের ধ্যান ধারণা, ভাবনা বেদনা সবই কোন একটা অন্তরস্থিত কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। তাতে আমাদের একটা ব্যক্তিত্ব, একটা সংহতি গড়ে ওঠে। অন্ত-জীবনের সেই কেন্দ্র থেকেই ব্যক্তির বিচিত্র প্রকাশ। সে প্রকাশ তখন আর যান্ত্রিক (mechanical) নয়, তা আত্মিক ; অধিজীবন থেকে চালিত হয় বলে তাকে বলি আধ্যাত্মিক।

আমাদের সামাজিক যা কিছু প্রকাশ, তাকে এই হিসেবে আধ্যাত্মিক অ্যাখ্যা দেওয়া যায়। সামাজিকতা, আধ্যাত্মিকতাই বটে ;—অন্তরের গভীরতর স্তর থেকে জীবনের প্রকাশগুলি সেখানে একটি বিশেষ ছন্দ লাভ করে। এই অধিজীবনের আশ্রয়টি হারালে ব্যক্তির প্রকাশ উন্মাদের শ্রীহীন, সুরহীন অসম্বদ্ধতায় পরিণত হয়। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে সমাজগত এই অধি-জীবন আমাদের কাছে এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে, এর গভীরতা আমরা সব সময়ে অনুভব করি না। তবু শৈশব থেকে সামাজিক হয়ে ওঠার নানা দীক্ষায় স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে সেই অধিজীবনটি পুষ্ট হতে থাকে। সামাজিকতা এই অর্থে আধ্যাত্মিকতা।

আমাদের পঞ্চভূতের জীবনে এই অধি-জীবনের জন্মটি বড় সামান্য কথা নয়। এই অধি-জীবনের রস-রসিকতাতেই পশুজীবনের বিচ্ছিন্নতা থেকে আমরা সরে আসি ; সমাজে লিপ্ত হই। অধি-জীবনের কেন্দ্র থেকেই জীবনতত্ত্বে উপনীত হই। যে যত বেশী অধি-জীবনে জাগ্রত, সে তত বেশি প্রকাশমান-তায় অগ্রসর। অধি-জীবন আচ্ছন্ন তো জীবনেও কূপমণ্ডুক, অধিজীবনে প্রতিষ্ঠিত তো বহুতে প্রকাশিত হওয়ার আবেগ। এ আবেগ ভালর দিকেও হতে পারে, মন্দের দিকেও হতে পারে। অধি-জীবনের প্রবর্তনাতেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত, লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ ; আবার অধি জীবনের প্রবর্তনাতেই শান্তি-অহিংসার মন্ত্রে বিশ্বমানবের দীক্ষা। অধি-জীবনে যে ভোগবাদী, সে ভোগের কথাই বিশ্বজনীন ভাবে বলে ; আবার অধি-জীবনে যে ত্যাগবাদী সে

বৈরাগ্যের কথাই বিশ্বজনীন ভাবে বলে। শুধুমাত্র ভোগ অথবা শুধুমাত্র ত্যাগ কোনটিতেই সমাজের মঙ্গল হয় না। ঋষি-জীবনেরও বিচিত্র স্তরভেদ আছে। বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদ থেকে জীবনবহির্ভূত সন্ন্যাসিতা পর্যন্ত ঋষি-জীবনেরই বিচিত্র প্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র আধ্যাত্মিকতাকে সমাজ-মঙ্গলের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। প্রীতিই তাঁর আধ্যাত্মিকতার সীমা। এ প্রীতি মানবসমাজ বহির্ভূত ব্রহ্মকে নিয়ে নয়, বিশ্বজীবনগত মানবত্মাকে নিয়ে। সমাজ চেতনায় বঙ্কিম এই অর্থে আধ্যাত্মিক। বঙ্কিমের আধ্যাত্মিকতা মঙ্গলচেতনায় পরিশুদ্ধ সামাজিক শালীনতা।

সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্যে বঙ্কিম এই যেমন আধ্যাত্মিকতার কথা বলছেন, তেমনি সমাজের তাৎকালিক অবস্থাকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়েই পর্য্যালোচনা করেছেন। তাই কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। কোন রকম পূর্ব্বসংস্কার না রেখে, বঙ্কিম ইতিহাসের নজির দিয়েই সমাজের গঠন বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে তিনি তাঁর দেশ, ধর্ম, ভাষা ও জাতির যে স্বরূপ প্রকাশ করলেন তাতে তাঁর আশ্চর্য মোহহীন দৃষ্টির পরিচয় পাই।

বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলই বঙ্কিমের বাঙলা দেশ। অনার্য প্রধান মিশ্র সঙ্কর জাতিই তাঁর দেশভ্রাতা, ব্রাহ্মণেতর নিম্নবর্ণ, সম্প্রদায়ই তাঁর দেশের জনতা, এবং আর্যসংস্কৃতি-পরিপুষ্ট গীতোক্ত কৃষ্ণবাণীই তাঁর ধর্ম।

ভাষাতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন এবং পুরাণেতিহাস পর্যালোচনা করে বঙ্কিম দেশ, সমাজ ও ধর্মের ধারণাটি স্পষ্ট করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষের পট-ভূমিকায় বঙ্কিম যদিও 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তবু সমাজ প্রসঙ্গে বিশেষ করে বাঙালী সমাজই তাঁর বক্তব্য ছিল। সেই বাঙলা সমাজের বৃহত্তর পটভূমি হল ভারতীয় সমাজ। তবু পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাবে আন্দোলিত হয়ে জড়ত্ব দূর করে বাঙলা সমাজই চিন্তায় ও আচরণে ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছিল। অনার্য জনতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্ম, এই তিনের সমন্বয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক নূতন অধ্যায় রচনা করবে, বঙ্কিম তা বুঝেছিলেন। এইখানে মনে রাখা প্রয়োজন মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতবর্ষে যে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, বঙ্কিমের ঠিক সে ধারণা ছিল না। বঙ্কিম ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে ভারতীয় জনতারই অংশ বলে তার সঙ্গে যেমন অবিচ্ছেদ্য যোগ

অনুভব করেছিলেন, তেমনি হিন্দুধর্মের সংস্কারে মুসলমান-জনতাও [illegible]: বিরোধী ধ্বংসাত্মক শক্তি হয়ে দেখা দেবে না, তারই সঙ্গে আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়েই একত্রে মিলে থাকবে, এ কথাই চিন্তা করেছিলেন। তাই রাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলমান, বৌদ্ধ কোন ধর্মেরই তার আশ্রয়ে লালিত হওয়ার বাধা নেই। বলাবাহুল্য, এ হিন্দুধর্ম তথাকথিত 'হিন্দুধর্ম' নয়। যার শাসনে ও পেষণে ভারতীয় জনতার বিরাট অংশ নানাভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। গীতা প্রবর্তিত এবং বঙ্কিম ব্যাখ্যাত এই নবীন হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে যে কোন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের (secular state) ধর্ম বলে প্রবর্তিত হতে পারে। এর নামটি পুরাতন, কিন্তু চরিত্রটি সনাতন। নাম এর হিন্দুধর্ম, কিন্তু মানবধর্মই এর চরিত্র। ধর্ম-নিরপেক্ষতা যদি ধর্মহীনতার নামান্তর হয়ে না ওঠে, তবে ভাবীকালের ভারতবর্ষকে তার বিচিত্র জনতা নিয়ে এই ধর্মেরই আচরণ করতে হবে, নাম যার মহামানবধর্ম। বঙ্কিমের ধ্যানেই এ-সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাই তাঁর সমাজচেতনায় ইতিহাসের গতিই ধরা পড়েছে বলে আমাদের ধারণা।

এ জন্যে ভারতবর্ষের জীবন-রঙ্গমঞ্চে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় আপনার মধ্যে গভীর একাকিত্বের বেদনা নিয়ে বাণীর নিভৃত আসনখানি পাতলেন জীবনের একনিষ্ঠ সাধক বঙ্কিমচন্দ্র। ধ্যানে অনুভব করলেন বিশ্বের কাছে পূর্বপুরুষের পুঞ্জীভূত ঋণ কতখানি, এবং সে ঋণশোধ কেমন করে কতদিনে হবে।

সামনে যে বহুদিনের জমাট বাঁধা অন্ধকার; ধর্মান্ধতার অন্ধকার, দারিদ্র্যের অন্ধকার। সর্বোপরি দেশব্যাপী স্বার্থপরতা ও পরাধীনতা। সবগুলিই যে পর্বতপ্রমাণ রূঢ় বাস্তব,—বহুদিনের জগদ্দল পাথর হয়ে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর ধারাকে রোধ করে দিয়েছে। বিচ্ছিন্ন জলাভূমির মতন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ স্রোতের অভাবে, আলোর অভাবে গাঁজিয়ে উঠেছে। ধর্মচেতনা নেই, মানবপ্রেম নেই। শ্বেত শৃগালের উপযুক্ত বিচরণ ভূমি!

সেই অমিয়ট, ফস্টর, গলষ্টনের বিরুদ্ধে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে লালিত পুঁজিবাদী জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, Woodroffe যাদের বলেছেন, "so called *Manasputtra* of British Empire"—সেই বিভ্রান্ত ইংরাজীনবীশদের বিরুদ্ধে, বহুদিনের পুঞ্জীভূত ঋণ শোধ করার জন্যে বঙ্কিম একখানি শাণিত কৃপাণের মতন, প্রভাত মার্তণ্ডের রৌদ্রচ্ছটার মতন, উপনিষদের প্রার্থনামন্ত্রের মতন উজ্জ্বল ললাট ও প্রজ্ঞা দৃষ্টি নিয়ে চিত্তশুদ্ধির সাধনায় একাকা পথে নেমে এলেন।

চিত্তশুদ্ধির সাধনা সুরু হল। সমাজসংস্কারের আগে আত্মসংস্কারের আয়োজন করলেন। সাধক বঙ্কিমের সমাজচেতনা Theory সর্বস্ব নয়, পাণ্ডিত্যের Text Book নয় ; তা ক্রিয়া-মূলক ; অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে আচার-আচরণ সাপেক্ষ। বঙ্কিম তাই সমাজসংস্কারে আত্মপ্রস্তুতির উপরেই জোর দেন। বঙ্কিম নিজেই এ প্রসঙ্গে নিজের দৃষ্টান্ত।

ইংরাজি শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করে অনাদৃত অবহেলিত মাতৃভাষার কাছে অন্তরের ক্ষুধা নিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণত্বের অহংকার দূর করে শূদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী তুললেন। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনতার জন্যে শিক্ষিত সমাজের সমবেদনা প্রার্থনা করলেন। পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার দাবী করলেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে সাম্যবাদের সাধ্যমত ধ্বনি তুললেন। বললেন, সকলেরই সমান অধিকার থাকা দরকার। শক্তি আছে, কিন্তু অধিকার নেই বলে যেন কেউ বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত থাকা চাই।

যিনি আত্মপ্রস্তুতির কথা বলেন, তিনি বিপ্লবের কথা বলেন না, ধৈর্যের কথা বলেন। বঙ্কিম পরম ধৈর্যে সমাজ সংগঠনের নির্দেশ দিয়েছেন ; বিপ্লবের পথে রাতারাতি স্বর্ণফল লাভের আকাশ-কুসুম কল্পনা করেন নি। যখন যুবসমাজের মনোভাব হল 'মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল' ; তখন কার ভরসায় বঙ্কিম পরাণমণ্ডলদের বিপ্লবের মধ্যে নিয়ে আসবেন ? জনতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার অধিকার না দিয়ে জীবন পথে যাযাবর করে দিতে চান নি বঙ্কিম। ইংরাজি শাসনের সুনিয়ন্ত্রণ চেয়েছেন, সাধারণ প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে বৃটিশ শাসনের নানা দুঃখ-গ্লানির মধ্যেই স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের সন্ধান করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বাঙলায় বৃটিশ শাসন কায়েমী রাখার কথা বলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমের 'কাকাতুয়া' নামক রম্যরচনাটি পাঠ করলেই আমরা বঙ্কিমের মনোভাব বুঝতে পারব।

সেই ইংরাজ কাকাতুয়াটিকে দাঁড় ছাড়াবার কোন হিংসাত্মক বৈপ্লবিক আয়োজন বঙ্কিম করেন নি। অগণিত বঙ্গজ পিপীলিকা তখন তারই প্রসাদ গ্রহণ করে ভাগীরথীর দুই তীরে নগরসভ্যতা গড়ে তুলছে। দাঁড়ে বসে কাকাতুয়া তাই দেখছে আর 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি'তে নিশ্চিন্ত হয়ে জন্মভূমির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে গান ধরেছে।

পাকা ইমারতের মধ্যে যে উচ্চ মধ্যবিত্ত পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন নব্য বঙ্গীয়েরা ইংরাজের চাপরাশ নিয়ে বসে আছে, তাদের আগে হটাতে হবে। কিন্তু তাদের বঙ্কিম সরাবেন কোথায়, তারাই যে দেশের কর্ণধার।

বঙ্কিম তাই তাদের জাত পাল্টাতে চাইলেন। বুঝলেন, ওদেরই অধিকার এনে দিতে হবে। ওই যুব-শক্তিকেই দেশের কাজে লাগাতে হবে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান-শক্তি ও মানবপ্রেমকে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাইতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে বিভ্রান্ত যুবসমাজ।

পরাণ মণ্ডলদের কথা বঙ্কিম জানতেন। কিন্তু তাদের খেপিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন না। ইংরাজ শাসনের কল-কে আগে ইংরাজের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে আসতে চাইলেন। বিপ্লবের চেয়ে চরিত্র-প্রস্তুতির কথায় গুরুত্ব আরোপ করলেন।

পরাণ মণ্ডলকে খেপানো সহজ ছিল, কিন্তু এ কাজ সহজ ছিল না। দেশের যুবশক্তিকে সন্তানধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলেন বঙ্কিম। অভিনব দুর্গোৎসবের গভীর আয়োজন শুরু করলেন।

পথ বড় জটিল, দুর্গম, বিচিত্র। তবু দেশমাতৃকার আশীর্বাদে তিনি উদ্দীপ্ত। তাই সকলকে ডাক দিলেন। বললেন ; নারী তুমি,—সেবায়, প্রেমে কল্যাণে সতী হও ; পুরুষ তুমি,—কর্মে, ধর্মে, সত্য-সাধনায় বীর হও ; দেশ-মাতৃকার চরণ বন্দনা করে সংযম-সাধনায় যদি পথ চল, ভাগ্যবিধাতার কাছে সিদ্ধি একদিন না একদিন পাবেই।

মাতৃবন্দনার সেই দিব্য সঙ্গীতের উত্তরে সিদ্ধি আমাদের দ্বারে উপস্থিত ; কিন্তু বঙ্কিমকে খুশি করতে পেরেছি কি ? আমাদের চিত্ত কি শুদ্ধ হয়েছে, অন্তরে ভক্তি কি জাগ্রত হয়েছে, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পথেই কি চলেছি আমরা ?

শারদোৎসবের নানা প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মধ্যে কমলাকান্তের কান্না এখনও শুনতে পান কি ?

যদি শুনে থাকেন, তবে আপনার নিজের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী

হিমালয়কে দেখতে হলে যেমন সমতলভূমি থেকে উঠে আসতে হয়, তেমনি বঙ্কিমের সমুন্নত জীবনভূমি থেকে দৃষ্টিপাত না করলে রবীন্দ্রপ্রতিভার দিব্যদ্যুতি আমরা দেখতে পাই না। আকাশের যে প্রচুর দাক্ষিণ্যে ধূসর প্রান্তরের ধুলা শ্যামল আচ্ছাদনে দূর হয়, সে দাক্ষিণ্যের কথা তৃণভূমি হয়তো ভুলে যায়, কিন্তু বনস্পতি তার আকাশ বন্দনায় নিত্য সে ঋণ স্মরণ করে। কবিগুরুর বঙ্কিম-বন্দনাই আমাদের সচেতন করে দেয় তাঁকে বোঝার জন্যেও বঙ্কিমকে বোঝার প্রয়োজন আছে। দুই প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা তখনই শ্রেয়, যখন একের আলোয় অপরকে দেখা সহজ হয়, একের গতি অপরের কাছে আমাদের পৌঁছে দেয়, যখন একের অভিজ্ঞতায় অপরের সম্বন্ধে চিত্তের জড়তা দূর হয়। এ উদ্দেশ্য ত্যাগ করে যাঁরা প্রতিভার তুলনামূলক বিচারে ভাল-মন্দের বিতর্ক নিয়ে আসেন তাঁরা কোন প্রতিভাকেই সম্মান দেন না।

বাঙলার আকাশে রবীন্দ্রনাথ অভিনব, কিন্তু আকস্মিক ন'ন। বহুদিনের পুঞ্জীভূত মেঘের দুর্যোগ সরে গিয়ে রাত্রির আকাশে অনেক তারা দেখা দিয়েছে, সূর্যোদয়ের দিকেই যাদের পথ-নির্দেশ। রবীন্দ্র-প্রতিভার তাৎপর্য আমরা তাই ঠিক বুঝব, যদি বঙ্কিম-প্রতিভার রশ্মি-রেখাকে অনুসরণ করি।

উত্তরসূরী তিনিই, যিনি পূর্ব-প্রতিভার ধ্যানকে অস্বীকৃতি দিয়ে বিপর্যস্ত করে দেন না, বরং মননের দ্বারা তাকেই আত্মস্থ করে নেন; ধ্যানের গভীরতাকে অনুসরণ করে প্রয়োগের ক্ষেত্র দেন বাড়িয়ে। এককে বিচিত্রের দিকে নিয়ে যান, যা মুষ্টিমেয়ের অধিকারে তাকে সর্বসাধারণের করে তোলেন।

রবীন্দ্র-দর্শনের মূলতত্ত্বটি হল সীমার মধ্যে অসীম, রূপের মধ্যে অরূপ, জীবনের মধ্যে জীবনাতীতের লীলা-তত্ত্ব। পূর্ণতাকে কবিগুরু স্বীকার করেছেন। বলেছেন: আমাদের জীবন পূর্ণতার দিকেই এগিয়ে চলেছে, আমরা নানা ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে সার্থকতারই ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি। জীবনাতীতের আভাস আমাদের জীবনের বিচিত্র লীলায় বারবার ধরা পড়ছে। শ্রেয়োসাধনার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে। এ অভিব্যক্তি জৈবিক নয়, আত্মিক।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মিক অভিব্যক্তিবাদ, অনুশীলন-তত্ত্বেরই ক্রম-পরিণতি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অনাদিতে যাহা প্রতিষ্ঠিত, অসীমে তাহাই প্রমাণিত হইতে থাকিবে।' বলেন, পুরাণে দেবতার কল্পনা ছিল, কিন্তু দেবতা ছিল না; স্থূলত্ব বর্জন করতে করতে তপস্যার মধ্যে দিয়ে মানুষই দেবতা হয়ে উঠবে।

অনুশীলন-তত্ত্বে বঙ্কিমও এ কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন, "আমার বিশ্বাস যে, একসময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক।"

চিন্তার ক্ষেত্রে দুজনের একটা মিল আমরা এই দেখি, দুজনেই পূর্ণতার আদর্শের কথা বলেছেন, এবং আমাদের জীবনকে সেই পূর্ণতার অভিমুখী করে দেখিয়েছেন। উভয়ের ধ্যানেই এই পরিপূর্ণতা মানবিক। প্রভেদ হল এই, বঙ্কিমের ধ্যানে এই পূর্ণতা মানব শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে নির্দিষ্ট, রবীন্দ্র-ধ্যানে তা মানবিক ভূমায় অনির্দিষ্ট, অসীম।

Perfectionism-এর সঙ্গে Humanism-এর যে একটা বিরোধ আছে রবীন্দ্রনাথের পূর্বস্থরী হিসেবে বঙ্কিমই তার প্রথম সুষ্ঠু সমন্বয়ের নির্দেশ দেন। পাশ্চাত্ত্যের Humanism-কে বঙ্কিম অস্বীকার করেন নি, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বকে তিনি একটি ধর্মচেতনার মধ্যে দিয়ে দেখেছেন,—পরিপূর্ণতার ভূমিকায় দেখেছেন। এই দৃষ্টিকে অনুসরণ করেই উত্তরস্থরী রবীন্দ্রনাথ আরও বিচিত্র কথা বলেছেন। বঙ্কিমের ধর্মচেতনা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতারই একটা যুগোপযোগী অনুবাদ। মানুষই বঙ্কিমের লক্ষ্য,—কিন্তু সে পরিপূর্ণ মানুষ। সেই পরিপূর্ণ মানবের রূপটি আবিষ্কার করে বঙ্কিম আমাদের নব্যবঙ্গের বস্তুপরতন্ত্রের সঙ্গে একটা আদর্শবাদ, Humanism-এর কল্যাণকামিতার সঙ্গে Spiritualion-এর ধ্যানধর্মের মহিমা যোগ করে দিলেন। যুক্তি দিয়েই বঙ্কিম প্রমাণ করলেন, পরিপূর্ণতার আদর্শ —মানবিক। বললেন, আমাদের চিত্তবৃত্তির অনুশীলনেই আমরা জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি। পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারি। এই অগ্রগামিতায় আমরা একটা সামাজিক শালীনতা লাভ করি। পরিপূর্ণতার জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা, তাকেই বঙ্কিম বললেন ভক্তি। ভক্তির চর্চা তাই জীবনেরই সাধনা। জীবনকে অস্বীকার করে কোন ধ্যান ও ধারণার কথা বঙ্কিম বলতে চান নি।

উত্তরস্থরী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবনের এই স্বীকৃতি যেমন আরও গভীর বেদনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সাধনার স্বরূপও বিচিত্র মূর্তিতে ধরা পড়েছে। বঙ্কিম বললেন, পরিপূর্ণ মানব—Perfect Human being-এর কথা;

রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানবিক পরিপূর্ণতা—Humanistic Perfection-এর কথা। একই আদর্শ, যুগভেদে ভিন্ন ধ্যানমূর্তি লাভ করেছে। একই চিন্তা,—বঙ্কিমের মধ্যে জন্ম নিয়েছে ও পরিপুষ্ট হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পেয়েছে গতি।

বঙ্কিম-চেতনায় একপ্রান্তে আছে অপূর্ণ, সীমিত, চিত্তবৃত্তির বিচিত্র বিক্ষোভে বিপর্যস্ত সাধারণ মানব;—আর একপ্রান্তে পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ,—ঈশ্বর। অনুশীলন-তত্ত্ব এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী সেতু। সেতুর মাঝ-বরাবর আমরা বেদনায়, সাধনায় অগ্রসর হই, কিন্তু পরিপূর্ণতার নির্দিষ্ট রূপটি নানা অক্ষমতায় জীবনের মধ্যে অনুভব করি না বলে তা অনেক সময় জীবন-বহির্ভূত আদর্শ বলে মনে হয়। ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্কিম যদিও এ আদর্শকে যুক্তিগ্রাহ্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য করে জীবনানুগ হিসেবেই উপস্থিত করেছেন, তবু এতে যেন একটা অধিকারী অনধিকারীর ভেদ এসে যায়। তাতে মোহ এবং মুক্তি, প্রেম এবং ভক্তি—উভয়কোটির মাঝখানে পরিপূর্ণতার তত্ত্ব এক দুর্লঙ্ঘ্য সোপান রচনা করে দেয় না কি? সাধারণ মানুষের কাছে, মাঝখানে আরও একটা পদক্ষেপ থেকে যায়।

পরিপূর্ণতার সাধনায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আমরা এই পথটা এগিয়ে যাব, এই কথাই বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 'সীমার সাধনা'র কথা বলে অনধিকারীর অধিকার দিয়েছেন বাড়িয়ে। পরিপূর্ণতাকে কোন বিশেষ তত্ত্বে নির্দিষ্ট না করে অসীমের দূরতম রহস্যলোকের দিকে আমাদের ধ্যানকে এগিয়ে দিয়েছেন। অসীমকে পাওয়ার কথা না বলে, তার আভাস ও ইঙ্গিত লাভের কথাই বলেছেন এবং তাইতেই সন্তুষ্ট থেকে সাধনার একটা গৌরববোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন।

কবিগুরু মানুষকে পরিপূর্ণ বলে স্বীকার করেন নি। একথা বলেন নি যে, আমাদের পরিপূর্ণ হতে হবে। তিনি বলেন, অপূর্ণতাই আমাদের সত্য; কিন্তু নানা অপূর্ণতার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি;—এগিয়ে চলেছি পূর্ণতার অভিমুখে। কিন্তু সে-পুর্ণতা অন্তহীন সাধনার প্রান্তে তত্ত্বরূপে, আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সাধনায় পূর্ণতা আমরা পাই না, পুর্ণতার ইঙ্গিত দিই মাত্র। পুর্ণতার কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই—তা অনির্দিষ্ট, অরূপ, অসীম।

কিন্তু এই অসীম, অরূপ—এ মানবিক।

পরিপূর্ণতার এই মানবিক প্রকৃতির মূলে বঙ্কিমের অনস্বীকার্য দান রয়েছে। বঙ্কিমের পরিপূর্ণ মানবই রবীন্দ্রনাথে মানবিক পরিপূর্ণতার রূপ নিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ

মানবিক ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করেছেন। যুগের প্রয়োজনে বঙ্কিম যাকে নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই অনির্দিষ্ট, অনন্তের দিকে মুক্তি দিয়েছেন।

বঙ্কিম জীবনকে একের নিষ্ঠায় যে সংহতি দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের লীলায় তাকেই গতি দিয়েছেন। এ গতিতে একের অস্বীকৃতি নেই। দুই প্রতিভাই পরিপূর্ণতার আদর্শে বিশ্বাসী। সংহতির দিকটায় জোর দিতে গেয়ে পথটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন বঙ্কিম, বলেছেন, এইভাবে চলতে হবে—অনুশীলন করতে হবে,—আহারে-বিহারে, অসনে-ব্যসনে এই ব্রত গ্রহণ করতে হবে। ভক্তের চরিত্র প্রকাশ করতে হবে জীবনে। নির্দ্দেশটি স্পষ্ট বলেই আমাদের কাছে যখন তা ভাল লাগেনি তখন বঙ্কিমকে রক্ষণশীল নীতিবাগীশ বলে গাল পেড়েছি। কিন্তু ভুলে যাই যে বঙ্কিমের প্রাকারে উঠে দাঁড়ালে তবেই রবীন্দ্রাকাশ দৃষ্টি গোচর হবে। বৈচিত্র্যের দিকে গতি এনে দিয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে পথটা কেটে দেন নি, বলেন নি,—এই পথে চল। বললেন তোমার পথেই চল,—কিন্তু 'চল'। যদি পথ চলা থামে তবেই মৃত্যু, তবেই মহতী বিনষ্টি। চলাটাই বড় কথা' সাধনাই শেষ কথা। পথ যদি ভুল করি, তবু ভুলের মধ্যে দিয়েও একদিন ভুলকে উত্তীর্ণ হব—এ আশ্বাস কবি আমাদের দিলেন। বললেন:

যে নিশীথে আপন হাতে নিভিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন,
একলা তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে।

কবিগুরু বলেন: এ সংসারে আমরা সবাই পথিক, সাধনার অধিকার নিয়ে আমরা জন্মেছি। এ সাধনায় নানা অপূর্ণতার মধ্যে সিদ্ধি যদি না ও-পাই, তবু আমরা ব্যর্থ নই। আমরা অপূর্ণ; এই অপূর্ণতাই আমাদের গৌরব।

কখন গৌরব?—যখন সাধনা করেছি তখন।

সিদ্ধির অভাব বিকার নয়, সাধনার অভাবই বিকার। তাই সিদ্ধি যদি না-ও পাই, তবু সাধনা যদি করে থাকি, তবে আমরা ব্যর্থ নই। আমরা অসীমকে পাই না, ব্যর্থ সাধনার মধ্যে দিয়ে অসীমের ঈঙ্গিত দিয়ে যাই, ব্যর্থ সাধনা, ছিন্নতন্ত্রী বীণা—এই আমাদের পরম ধন।

অসীমের ইঙ্গিত দিয়ে সীমা সীমিত হয়েও তাই সার্থক হয়। তখন জীবনকে

স্বীকার করেই জীবনের মধ্যে জীবনাতীতকে পাই। তখন রূপের মধ্যেই অরূপের দ্যুতি, বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ। মোহই তখন মুক্তিতে দীপ্যমান, প্রেমেই ভক্তিতে ফলবান হয়ে ওঠে।

বঙ্কিম জীবনবেদ থেকে আমরা তাই স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথে উপনীত হই। এতে আমরা সাধনার সেই সেতুটি থেকে নেমে আসি না, বরং যে পদক্ষেপটি বঙ্কিম সাহিত্যে অনুপস্থিত, "সার্থক সীমার" সোপানটিতে সেই পদক্ষেপ সম্ভব হয়। তখন সামনে আর নির্দিষ্ট পরিপূর্ণতা নয়, অনির্দিষ্ট অনন্ত। ইনিও পূর্ণ, ইনিও মানবিক। কিন্তু এ মানবিক ভূমা অনির্দিষ্ট, অসীম; তাই একে ঘিরে অনন্ত পথ চলার আনন্দাবেগ।

পথ চলার আনন্দে জীবনের বাধাগুলি মুক্তির উপায় হয়েই দেখা দিয়েছে রবীন্দ্র-চেতনায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাই বাধা অতিক্রম করার কথা যেমন আছে, সেগুলি যে বিচিত্র বেদনার সঙ্গীত রচনা করে, সে বেদনা আস্বাদনের কথাও আছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে সিদ্ধির আনন্দ গভীর হয়ে ওঠায় সাধনার কোন রসাস্বাদনের বিষয় হয়ে ওঠে নি, আনন্দ সঙ্গীতের প্রেরণা হয়ে ওঠে নি। জীবনের দ্বন্দ্বে বাধাগুলি তাই গভীর অপরাধ বোধই জাগিয়ে তুলেছে, কোন চরিত্রই সেগুলিকে শ্রদ্ধা করে নি, আপনাকেও শ্রদ্ধেয় করে তোলে নি।

কিন্তু সাধন-স্বভাবের কাছেই যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবেদন এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। বঙ্কিমের কাছে অনুশীলনের দীক্ষা, পথ চলার সঙ্কল্প যদি না নিই, যদি না বেদনার মধ্যে তা অনুভব করি ; ধর্মে, কর্মে, প্রতিদিনের আচার-আচরণে, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধায়, গুরুজনের প্রতি বিনয়ে, দেশপ্রেমে, মানব প্রীতিতে,—অর্থাৎ কবিগুরুর ভাষায় 'প্রতি দিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি সুখী করি সর্বজনে'—পথ-চলাকেই রূপায়িত না করি, তবে তো রবীন্দ্র-সাহিত্যের পথিক জীবনের আনন্দবার্তায় অধিকার হবে না। অনুশীলনের বাণী নিষ্ঠায় রূপ না নিলে সাধনা স্বভাবে পরিণত হবে না। বঙ্কিম-চেতনায় যে ভক্ত, রবীন্দ্রধ্যানে সেই পথিক। তানটা একই, শুধু সপ্তকটা আলাদা। উদরায় যে তানের সংহতি, মুদারা থেকে তারায় তারই বিচিত্র গতি।

মানবতার আদর্শকে সাধনার মধ্যে দিয়ে কর্মে রূপ দেওয়ার কথা বলেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উত্তরসূরী। তবে, বঙ্কিম যেখানে জীবনের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতির কথা বলেন, রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে জীবনের কোন একটা রূপকেই সার্থক করে তোলার কথা বলেন। রূপায়ণে বৈচিত্র্যের অবকাশ আছে

বলে এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, এটা কর্ম-নিরপেক্ষ, নিয়ম বহির্ভূত যথেচ্ছাচারিত। বঙ্কিমের মত রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেন যে,—"ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মত দুর্গম। সে পথ যদি অসীম বিস্তৃত হইত, তবে সকল মানুষের যেমন তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোন বাধা-বিপত্তি থাকিত না। কিন্তু সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এই জন্যই তাহা দুর্গম।" ['সীমাও অসীমতা' পথের সঞ্চয়]

সাধনার এই কঠোরতা স্বীকার করেই কবিগুরু বললেন, জীবনে কোন একটা সীমাকে সত্য করে সার্থক করে তুলতে হবে। আমরা স্পষ্টভাবে একটা কিছু হয়ে উঠব। অস্পষ্টতাই ক্ষতিকর। সর্বাঙ্গীন পরিণতি যদি না-ও পাই, কোন একটা সীমাকেও যেন সার্থক করতে পারি।—"জীবনে একটি মাত্র কথা ভাবিবার আছে যে আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব, কি কর্মী হইব, কী আর কিছু হইব সেটা নিতান্তই ব্যর্থচিন্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থই এই, কোথায় আমার সীমা সে কথা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব।"—['সীমার সার্থকতা' : পথের সঞ্চয়]

'যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য, সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা।'—সীমার এই সার্থকতাকে স্বীকার করেছেন বলে সাধনার ক্ষেত্রকে বহুর মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ। সাধন-স্বভাবের ভূমিকায় আমাদের জীবনের এক নূতন পরিপ্রেক্ষিত তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত হল। চিত্তবৃত্তির অসামঞ্জস্যে জীবনের যে বিরোধ, রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রেয় ও শ্রেয়, অহং ও আত্মা, ব্যক্তি ও বিশ্বের বিরোধের মধ্যে দিয়ে অনুবাদ করলেন। অনুশীলনে যা ভক্তি, সাধন-স্বভাবে তাই প্রেম—বিশ্বজীবনগত প্রেম। বঙ্কিমের 'আদর্শ সমাজ' রবীন্দ্রনাথের 'বৃহত্তর বাস্তবে' ক্রম-পরিণতি লাভ করেছে। বঙ্কিমের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে না দেখলে এই 'বৃহত্তর বাস্তব'-ও যে সাধনা-সাপেক্ষ, তা আমরা বুঝতে পারব না। অনুশীলিত জীবন ছাড়া যে সাধনা স্বভাবে পরিণত হয় না, এবং সাধন-স্বভাব ভিন্ন যে বিশ্বজীবনগত প্রেমচেতনার স্ফুরণ নেই—একথা বঙ্কিমের শক্ত এবং উঁচু পাটাতনে দাঁড়ালেই আমরা বুঝব। বঙ্কিমের কাছ থেকে অনুশীলনের দীক্ষা না নিলে, মানবতার আদর্শকে প্রতিদিনের কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখার ব্রত না নিলে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-চেতনার বাণী আকস্মিক বলেই মনে হবে। প্রতিদিনের জীবনে সত্যরূপে তাকে দেখার সক্রিয় অভিপ্রায় থাকবে না। এতে অনধিকারীর কাছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ রোমান্টিক কবি-কল্পনার ভাবসমৃদ্ধ

আদর্শবাদ বলে মনোহরণ করবে, এবং তাঁকে কর্মনিরপেক্ষ বলে জেনে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির অজুহাতে লঘু মানস-বিলাসেরই প্রশ্রয় দেব।

অতি আধুনিক যাঁরা বঙ্কিমকে রক্ষণশীল নীতিবাগীশ বলে গাল দিয়েছেন, পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র-জীবন-বাণীকেও তাঁরা কর্মজগৎ থেকে ভাব জগতের মধ্যে নির্বাসন দিয়েছেন। সেই নির্বাসনে যুগের দিকে চেয়ে রসিক সমালোচকের দৃষ্টিও যে কতখানি আচ্ছন্ন হয়েছে শ্রীমোহিতলালের রবীন্দ্র-সাধনাও সংস্কৃতির মূল্যায়ন থেকেই তা বুঝতে পারি। ভক্তির ধোঁয়া আর অভক্তির ধুলো থেকে চোখ ঢাকতে গিয়ে সূর্যকেই তিনি আড়াল করে ফেলেছেন। কর্মরূপের দিক থেকে বঙ্কিমের আদর্শবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদকে পৃথক বলেই তাঁর মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন বাণীকে কর্ম-নিরপেক্ষ ভাবসাধনা—'ecstasy of art or contemtlation' বলেই তিনি কিঞ্চিৎ করুণা করেছেন।

অথচ সাধনার বিচিত্র পথ নির্দেশ দিয়েছেন বলেই, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী। তাই বঙ্কিম-জীবন-বেদের দৃঢ় ভিত্তি আশ্রয় না করলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ জীবনে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। আবার জীবনে কর্মের মধ্য দিয়ে রূপ দেওয়ার ব্রত না নিলে এ দুই প্রতিভার সমন্বয়ের সূত্রটিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। ভাবের দিক থেকে, ধ্যানের দিক থেকে কোন প্রতিভা কোনখানে পৌঁছিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সাধারণের পক্ষে একদিকে যেমন স্পর্ধা-জনক অপরদিকে তেমনি বিভ্রান্তিজনকও বটে। কিন্তু কর্মের দিক থেকে উভয়ের বাণী জীবনে প্রকাশ করার অধিকার আমাদের আছে এবং সেই অধিকার নিয়ে বঙ্কিম থেকে স্বাভাবিক ভাবেই আমরা রবীন্দ্রনাথে উপনীত হতে পারব বলেই আমাদের ধারণা। তখন উভয়ের দান সমভাবে এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবনে সার্থক হবে।